একক ১ ❑ অপরাধ ও বিচ্যুতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ অপরাধের সংজ্ঞা

১.৩.১ অপরাধের কারণ

১.৪ অপরাধজনিত আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

১.৪.১ ধ্রুপদী তত্ত্ব

১.৪.২ জৈবিক তত্ত্ব

১.৪.৩ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

১.৪.৪. সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

১.৫ ভদ্রলোকের অপরাধ

১.৬ কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা

১.৬.১ কিশোর অপরাধ ঃ ভারতবর্ষের ছবি

১.৬.২ কিশোর অপরাধের কারণ

১.৭ সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

১৮. সারাংশ

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে বিষয়গুলি আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, তা হল—

- অপরাধ কেন সংঘটিত হয়?
- অপরাধমূলক আচরণের পেছনে কী কী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে?

- ভদ্রলোকের অপরাধ বলতে কী বোঝায়?
- কিশোর অপরাধ কাকে বলে?
- কোন কোন কারণের জন্যে কিশোর অপরাধ ঘটে?
- অপরাধজনিত সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়?

১.২ প্রস্তাবনা

প্রতিটি সভ্য সমাজেই 'সামাজিক সমস্যার' অস্তিত্ব হয়োত একটি আবশ্যিক দিক। সমস্যার মাত্রা-ভেদে তা কম বেশি হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীর উন্নত বা অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশে আমরা এমন কোন সমাজের কথা ভাবতে পারি না যেখানে 'সামাজিক সমস্যা' নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ কাকে বলব সামাজিক সমস্যা? বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন। সেইসব সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলা যায়—সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হয় এমন পরিস্থিতিতে, যা মানুষের অভিপ্রেত বা কাঙ্ক্ষিত নয় এবং এই পরিস্থিতি ''Social ideal'' বা সামাজিক আদর্শ থেকে অবশ্যই এক ধরনের deviation বা বিচ্যুতি।

দারিদ্র্য, শিশু অপব্যবহার, অপরাধ প্রবণতা ও বিচ্যুতি, মাদক ও উত্তেজক ওষুদপত্র গ্রহণে আসক্তি, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা—এমন নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে আমরা অতিমাত্রায় পরিচিত। এছাড়াও আমাদের সমাজে রয়েছে পরিবেশের সমস্যা, বয়স্ক মানুষের সমস্যা, এবং অবশ্যই মহিলাদের সমস্যা। মহিলাদের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক হিংসাত্মক আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে নানা ঘটনায়—তা আমরা জানতে পারছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে। গণমাধ্যমের অন্যান্য দিকগুলিও সম্প্রতিকালের সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে যথেষ্ট সোচ্চার। সমাজের নানা স্তরে বিদ্যমান এইসব নানামাত্রিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষকে যেমন পীড়িত করেছে, তার থেকে বেশি এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে সমাজতাত্ত্বিকদের। তারা তাই অন্বেষণ করেছেন এইসব সমস্যার উৎসগুলির, জানতে চাইছেন সমস্যাগুলির প্রকৃতি এবং অবশ্যই অনুসন্ধান করছেন সমস্যাগুলি নিরসনের উপায় কিংবা সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের পুনর্বাসনের পদ্ধতি। ফলে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় 'সামাজিক সমস্যা' বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমরা তিনটি সামাজিক সমস্যার বিষয়ে জানব, যেমন—অপরাধ ও বিচ্যুতি, শিশু অপব্যবহার এবং যুব সমস্যা। আলোচ্য পর্যায়ে স্বতন্ত্র তিনটি পর্যায়ে এই তিনটি সমস্যা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

১.৩ অপরাধের সংজ্ঞা

'অপরাধ' এই শব্দের মধ্যে এমন একটি দ্যোতনা আছে, যা দিয়ে বোঝা যায় আইনবিরুদ্ধ কিংবা অ-সামাজিক কাজকর্মকে। কেউ কেউ আবার 'অপরাধ' বলতে সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকে বোঝেন। তবে যে কোন ধরনের বিচ্যুতি, কিন্তু, অপরাধমূলক কাজ নয়। তাহলে 'অপরাধ'কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? এই বিষয়ে হল জেরোমের (Hall Jerome; 1947) বক্তব্য শোনা যেতে পারে। জেরোম বলেছেন অপরাধ হচ্ছে ''legally forbidden, and intentional action, which has a harmful impact on social interests, which has a criminal intent, and which has legally prescribed punishment for

it.'' অর্থাৎ অপরাধ হচ্ছে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা সামাজিক স্বার্থকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া, অপরাধের পেছনে কার্যকরী উদ্দেশ্যটিও অপরাধমূলক এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আইন—নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা আছে। থর্সস্টেন সেলিন (Thorsten Sellin; 1970) অপরাধকে বলেছেন ''violation of conduct norms of the normative groups'', অর্থাৎ 'আদর্শনিষ্ঠ গোষ্ঠীর আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতি'। তারও আগে Mowrer (1959) অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোন জটিলতার অবতারণা না করে সরাসরি একে বলেছেন ''Crime is an anti-social act'' অর্থাৎ অপরাধ হচ্ছে একটি অ-সামাজিক কাজ।

১.৩.১ অপরাধের কারণ

অপরাধ কেন ঘটে? কেন মানুষ এমন আচরণ করে যা দেশের, সমাজের প্রচলিত আইনকে লঙঘন করে? —এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, মানুষের, বিশেষ করে কিছু মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে অপরাধ প্রবণতা—এরই প্রতিফলন ঘটে নানা ধরনের কাজে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা যখন অপরাধ ও বিচ্যুতির তত্ত্বগুলিকে জানব, তখন হয়তো মনস্তাত্ত্বিকদের মতের সমর্থন খুঁজে পাব। এছাড়াও, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, দারিদ্র্য, কর্মহীনতা কিংবা অতিমাত্রায় লোভ, বিলাসবহুল সুখী জীবন যাপনের আকাঙক্ষা থেকেও মানুষ অপরাধের পথে পা বাড়ায়। অপরাধ বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে অপরাধের নানা কারণ খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে থাকে ব্যক্তিগত কারণ ও সামাজিক কারণ। সাধারণত আমাদের সমাজে তিন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়—হিংস্র বা চরম অপরাধ (Violent Crimes), অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধ (Property Crimes) এবং ভদ্রলোকের অপরাধ (White-collar Crime)। ভদ্রলোকের অপরাধ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে, এছাড়া অপর দুটি ধরনের অপরাধের মধ্যে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ (হিংস্র বা চরম অপরাধ), চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি (অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ)। প্রতি বছরে প্রায় ২১/২২ লক্ষ অপরাধের ঘটনার অনুসন্ধানের দায়িত্ব হাতে নেয় পুলিশ, যার মধ্যে ৩০ শতাংশ অপরাধ নথিভুক্ত হয় Indian Penal Code (IPC) বা ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে আর বাকি ৭০ শতাংশ স্থানীয় ও বিশেষ বিধির অধীনে (under the local and special laws)। অপরাধের পরিসংখ্যান বিষয়ে Indian Penal code-এর বিন্যাসে জানা যায় যে গত শতকের নয়ের দশকে হিংস্র অপরাধ ঘটেছিল ১৪.৪ শতাংশ, অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ২৬ শতাংশ, ভদ্রলোকের অপরাধের সংখ্যা ৩.১ শতাংশ এবং uncategorized বা অ-শ্রেণীভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৫৬.৫ শতাংশ। আমাদের বর্তমান পাঠ্যসূচীতে কত ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়, এ সম্পর্কে যদিও কোন আলোচনার অবকাশ নেই—তবুও অপরাধের শ্রেণীবিভাজন বিষয়ে জানা দরকার এই জন্যে যে এর মাধ্যমে নানা ধরনের অপরাধের পেছনে সক্রিয় কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, নিউ দিল্লি (National Crime Records Bureau, New Delhi) গত শতকের নব্বইয়ের দশকে যে তথ্য প্রকাশ করে তাতে দেখা যাচ্ছে হিংস্র অপরাধের তুলনায় অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ ঘটেছে বেশি অর্থাৎ হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির তুলনায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই-জনিত অপরাধের ঘটনা বেশি ঘটেছে। ১৯৬৬ সালে বেকার (Becker) প্রদত্ত পরিসংখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে আমেরিকায় ৭৭ শতাংশ অর্থনৈতিক অপরাধ ঘটেছে ও ২৩ শতাংশ অপরাধ ঘটেছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। NCRB (জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো) জানিয়েছে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। প্রতিটি ১০০ জন অপরাধীর মধ্যে যেখানে ৯৬ জন পুরুষ অপরাধী, সেখানে মহিলা অপরাধীর সংখ্যা মাত্র ৪ জন (১৯৯৪ সালে)। বিভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে

অপরাধের হার বেশি, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অপরাধের প্রবণতা আছে—তবে তা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় কম। তাছাড়া, ১৮-৩০ এই বয়ঃসীমার মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৫১ শতাংশ); ৩০-৩৫ বয়ঃসীমার মধ্যে পড়ছে ৪১ শতাংশ অপরাধী, ৫০+ বয়সী মানুষের মধ্যে রয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ আর মাত্র ১ শতাংশ অপরাধী রয়েছে ১৬-১৮ এই বয়ঃসীমায়। ভারতবর্ষে সংঘটিত অপরাধের এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে দারিদ্র্য, লোভ, ধনী হবার আকাঙ্ক্ষার কারণে বেশিরভাগ মানুষ অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে; তাই গৃহ-ডাকাতি বা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি ধরনের অপরাধ ঘটে। হত্যা বা খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ক্রোধ বা হিংসা, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে। অবশ্য অনেক সময় অর্থনৈতিক কারণের জন্যেই হত্যার মতো নৃশংস অপরাধ ঘটে। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো অপরাধ আমাদের সমাজে নারীর নিষ্ক্রিয় সামাজিক অবস্থানের ছবিটিকেই স্পষ্ট করে তোলা। অপহরণের ঘটনাও ঘটে সাধারণত অর্থের লোভের জন্যেই; কারণ গত কয়েক দশক ধরে অপহরণের যেসব ঘটনা ঘটেছে আমাদের সমাজে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অপহৃত ব্যক্তির জীবনের বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।

নারীর তুলনায় পুরুষদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি, এর কারণ হিসাবে বলা যায় নারী সমাজ-অনুমোদিত আচরণ-বিধিকে হয়তো লঙঘন করতে দ্বিধাগ্রস্ত। পুরুষরা আচরণ-বিধি থেকে বিচ্যুত হবার ব্যাপারে অনেক বেশি সাহসী। এছাড়া নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার (১৮-৩০ কিংবা ৩০-৩৫) মানুষের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা বেশি থাকার কারণ তারুণ্য থেকে যুবক অবস্থায় মানুষ অনেক বেশি সক্রিয় থাকে, তাই সামাজিক আদর্শ আচরণ বিধি লঙঘন করে 'অপরাধে'র মতো আইন-লঙঘনকারী কাজে লিপ্ত হয়। এরপর আমরা অপরাধ সংঘটিত হবার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে—তার ওপর আলোকপাত করব।

১.৪ অপরাধজনিত আচরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই, প্রতিটি সমাজেই অপরাধ ও বিচ্যুতি ঘটে থাকে। 'অপরাধ' ও 'বিচ্যুতি' এই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থগত তেমন ফারাক নেই। 'অপরাধ' হল আইন লঙঘনকারী কাজ আর 'বিচ্যুতি' হল সমাজ অনুমোদিত আদর্শ আচরণবিধি (Norms)-কে অনুসরণ না করা (Non-conformity)। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা 'অপরাধ' কথাটিই ব্যবহার করব। উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে 'অপরাধ' একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। কেন সংঘটিত হয় অপরাধ?—এর কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন মনস্তত্ত্ববিদ, অপরাধবিজ্ঞানী থেকে সমাজতত্ত্ববিদেরা। এই কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস থেকেই এরা যেসব তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন, সেগুলিকে আমরা চারটি ভাগে বিভাজিত করতে পারি ঃ

(১) ধ্রুপদী তত্ত্ব (Classicist theory)

(২) জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব (Biological view)

(৩) মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological view) এবং

(৪) সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological theory)

১.৪.১ ধ্রুপদী তত্ত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অপরাধ সংক্রান্ত ধ্রুপদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

অপরাধীর বিচার ও শাস্তির নামে যে নির্মম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাজনৈতিক সংস্কারকগণ ও জ্ঞানদীপ্ত (enlightened) চিন্তাবিদ্‌রা। এই সংস্কারক ও চিন্তাবিদ্‌দের ভাবনার প্রতিক্রিয়া রূপেই অপরাধ বিষয়ক ধ্রুপদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ধ্রুপদী তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন বেকারিয়া (Beccaria, 1764) নামে একজন ইতালীয়। তিনি প্রভাবিত ছিলেন জন হাওয়ার্ড (John Howard) এবং বেন্থাম (Bentham)—এর মতো পণ্ডিতদের রচনা দ্বারা। বেকারিয়া তাঁর ''ধ্রুপদী তত্ত্বে'' যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছিলেন, তা হল—(১) মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত হয় আত্ম-স্বার্থ ও যুক্তির মাধ্যমে, (২) সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক চুক্তি এবং ঐক্যমত্য, (৩) অপরাধ বলতে সমাজ অনুমোদিত আদর্শ আচরণকে বোঝায় না; অপরাধ হচ্ছে আইনী বিধি (legal code) লঙঘন করা; (৪) ব্যক্তির যুক্তিসংগত প্রেষণার (motivation) কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় এবং পরিশেষে (৫) দোষী বা অপরাধীর শাস্তিদানের ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রণে'র নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা দেখা উচিত।

১.৪.২ জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব

জীববিদ্যামূলক তত্ত্ব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যার নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তিনি হলেন ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানী সিসারে লমব্রসো (Cesare Lombroso)। পেশায় চিকিৎসক এবং অপরাধ-নৃতত্ত্ববিদ্যার (Criminal Anthropology) অধ্যাপক লমব্রসোকে বলা হয় 'অপরাধবিজ্ঞানের জনক'। তিনি ১৮৭৬ সালে 'Theory of Born Criminals' বা ''Theory of Physical Criminal Type'' নামে একটি তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি দাবি করেন যে অপরাধী ও অপরাধী নয় এমন দুজন মানুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অপরাধীর চেহারায় কিছু বিকৃতি থাকবে; যেমন অস্বাভাবিক বড় কান, লম্বা বাহু, চ্যাপ্টা নাক, খুঁতযুক্ত চোখ, ব্যথা ও কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীনতা এরকম ধরনের কতগুলি বিকৃতি।

পরবর্তীকালে চার্লস গোরিং (Charles Goring; 1913)—যিনি ছিলেন ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ্ তথা দার্শনিক—লমব্রসোর ''Theory of Born Criminals'' (জন্মগত ভাবে অপরাধীর তত্ত্ব)-কে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, কোন অপরাধীর শরীরে এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না যা দিয়ে তাকে 'অপরাধী' হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। গোরিং অপরাধ-প্রবণতার কারণ হিসাবে বংশগতির (heredity) প্রভাবের কথা বলেন। আর দুজন অপরাধবিজ্ঞানী ফেরি এবং গ্যারোফেলো (Ferri and Garofalo) লমব্রসোর তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তবে তাঁরা এই তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ না করে সামান্য সংশোধন করে বলেন যে সব অপরাধীই কিন্তু 'জন্মসূত্রে অপরাধী' নয়।

অপরাধের জীববিদ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নতুন মাত্রা পেল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ''Physical Anthropologist'' (শারীর নৃতত্ত্ববিদ) হুটন-কৃত (Hooton) গবেষণায়। ১৯৩৯ সালে তাঁর সুদীর্ঘ বার বছর ব্যাপী গবেষণার ভিত্তিতে হুটন (Hooton) বলেন যে, অপরাধের প্রাথমিক কারণ হল 'biological inferiority' বা 'জৈবিক হীনম্মন্যতা'। এই জৈবিক হীনম্মন্যতা হচ্ছে বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য।

১৯৪০ সালে (Sheldon) শেলডন অপরাধ প্রবণতার এক নতুন জৈবিক ব্যাখ্যা দেন। মানুষের শরীরের গঠন অনুসারে তিনি ব্যক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাজিত করেন, যেমন—Endomorphic, Ectomorphic এবং Mesomorphic। এই বিভাজনের ভিত্তিতে তিনি অনুমান করেন যে মানুষের শারীরিক গঠন ও অপরাধ প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং অপরাধী ব্যক্তি নিরাপরাধ ব্যক্তির তুলনায় তার শারীরিক গঠনের দিক থেকে অনেক বেশি

''mesomorphic''। বলা বাহুল্য, (Sheldon) শেলডন-এর বই ব্যাখ্যা একেবারেই সমর্থন লাভ করেনি, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানীদের; কারণ তাঁদের মতে, অপরাধ হচ্ছে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। অপরাধপ্রবণ আচরণ কখনোই জৈবিকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত থাকতে পারে না।

১.৪.৩ মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

অপরাধ-প্রবণতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে দোষী বা অপরাধী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকাই সংগত। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে তিন ধরনের তত্ত্ব দেখা যায়—সাইকোজেনিক (মন-সংক্রান্ত), সাইকোলজিক্যাল (মনস্তাত্ত্বিক) এবং সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল (মনসংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী)। সাইকোজেনিক (Psychogenic) তত্ত্বে জোর দেওয়া হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান কোন ত্রুটির ওপর যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সাইকোলজিক্যাল (Psychological) তত্ত্বে বলা হয় অপরাধীর মানসিক দুর্বলতা বা কম বুদ্ধ্যঙ্ক-এর অধিকারী হওয়ার কথা (Low Intelligence Quotient or IQ) আর সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল (Psycho-analytical) তত্ত্বে অপরাধ-প্রবণতার কারণ হিসাবে দায়ী করা হয় অ-বিকশিত 'ইগো' (undeveloped ego) কে। এখানে উল্লেখ্য, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে এই তৃতীয়টি অর্থাৎ সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল নামক তত্ত্বটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই জনপ্রিয়তার জন্যে যাঁর অবদান স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud), ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ফ্রয়েড তাঁর এই তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এ কথা ঠিক ফ্রয়েড সম্পূর্ণভাবে কোন 'অপরাধ-তত্ত্ব' নির্মাণ করেননি, কিন্তু মন-বিশ্লেষণের আলোচনায় ইড্, ইগো ও সুপার-ইগোর (Id, Ego and Super-ego) ধারণার উপস্থাপন করে ফ্রয়েড স্বতন্ত্র একটি ব্যাখ্যা দেন, যা মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ নির্দেশে সক্ষম হয়েছিল। (Id) ইড্ হচ্ছে মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা আকাঙক্ষা, (Ego) ইগো হচ্ছে বাস্তব আর সুপার-ইগো (Super-ego) হচ্ছে ব্যক্তির বিবেক বা নৈতিক বৈশিষ্ট্য। ফ্রয়েডের মতে, সুপার-ইগো সবসময়েই মানুষের প্রকৃত প্রবৃত্তি বা 'Id' কে দমন করতে চায়; আর ইগো (ego) ইড্ (Id) (Super-ego) মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে চায়। ইড ও সুপার-ইগো হচ্ছে মূলত ব্যক্তিত্বের অ-সচেতন অংশ আর ইগো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সচেতন (Conscious) অংশ। তাই অপরাধ হচ্ছে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক দিকে অ-সচেতন বা unconscious অংশের প্রতিফলন। এছাড়া মানুষের মধ্যে যে মূল প্রবৃত্তিগুলি (drives) আছে তার দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতেও অপরাধ-প্রবণতা প্রকাশ পায় ও অপরাধ ঘটে। ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যা যাঁদের প্রভাবিত করেছিল, তাঁরা হলেন অ্যাডলার (Adler), এ্যাব্রাহামসেন (D. Abrahamsen), ফ্রায়েডল্যান্ডলার (Friedlander) প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, শুধু ডেভিড এ্যাব্রাহামসেনের (David Abrahamsen: 1952) ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার, এই জন্যে যে এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। অপরাধ প্রবণতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ্যাব্রাহামসেন একটি ফমুর্লা (formula) গড়ে তোলেন; $C = \frac{T+S}{R}$। এখানে 'C' হলো অপরাধ, 'T' হচ্ছে 'প্রবণতা' 'S' নির্দেশ করছে 'পরিস্থিতি' এবং 'R' হলো 'প্রতিরোধ'। সুতরাং

$$\text{অপরাধ} = \frac{\text{প্রবণতা} + \text{পরিস্থিতি}}{\text{প্রতিরোধ}}$$

এ্যাব্রাহামসেনের মতে ব্যক্তির যখন দৃঢ় অপরাধ প্রবণতা থাকে, পরিস্থিতিও তার অনুকূলে থাকে এবং প্রতিরোধের ক্ষমতা যদি দুর্বল হয়, তাহলে'অপরাধ' ঘটবেই। বলা বাহুল্য, সমাজতাত্ত্বিকেরা ফ্রয়েডের বা এ্যাব্রাহামসেনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি, তাই অপরাধ-প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঁরা এইসব তত্ত্ব গ্রহণ করেননি।

১.৪.৪ সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি যখন সমাজে সংঘটিত অপরাধের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারল না তখন সমাজতাত্ত্বিকেরা নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন। অবশ্য, জৈবিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের উদ্ভবের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তবে অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সমাজতত্ত্বেই, কারণ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জন্যে অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক কারণ (বিভিন্ন সমীক্ষায় যা দেখা গেছে) দায়ী থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক কারণগুলিই সক্রিয় থাকে। অপরাধ সম্পর্কে সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল যে বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক অনুসরণ (Conformity) এবং বিচ্যুতির মধ্যেকার সম্পর্ক। এখানে উল্লেখ্য যে আধুনিক সমাজেও ভিন্ন ভিন্ন উপসংস্কৃতি (Subculture) আছে এবং কোন এক উপসংস্কৃতির নিয়ম-বিধি অন্য উপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচ্যুতি (deviance) বলে গণ্য হতে পারে।

(ক) অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় এডউইন এইচ সাদারল্যান্ড (Edwin H. Sutherland) প্রণীত 'Differential Association Theory' বা 'পার্থক্যমূলক সংঘ বিষয়ক তত্ত্বের' (১৯৩৯) কথা। এই তত্ত্বের মধ্যে তিনি দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন—(১) পরিস্থিতি বা পরিবেশগত (Situational) এবং (২) বংশগত (genetic)। সাদারল্যান্ডের ধারণাটি অনেকটাই স্বচ্ছ। প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন কোন পরিবেশ মানুষকে অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রতি আকর্ষণ করে এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী অপরাধীর জীবনের অভিজ্ঞতা বা বড় হয়ে ওঠার মধ্যেই অপরাধ-প্রবণতার উৎস লুকিয়ে থাকে। অপরাধমূলক আচরণ বিশ্লেষণ করার সময় সাদারল্যান্ড নিজে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন।

সাদারল্যান্ডের মতে, সারা জীবন ধরে মানুষ নানা ধরনের সামাজিক প্রভাবের মধ্যে দিয়ে চলে এবং এমন অনেক মানুষের সাহচর্যে আসে—যারা অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে মানুষের শেষ পর্যন্ত অপরাধ-প্রবণতা জন্ম নিতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে সাদারল্যান্ড বলেছেন ''পার্থক্যমূলক সংঘ''। তাঁর ধারণায়, অপরাধমূলক আচরণ অনেকাংশেই হল প্রাথমিক গোষ্ঠী অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শেখা। এই শেখার মধ্যে থাকে অপরাধ সংঘটিত করার পদ্ধতি ও কৌশল। অনুকূল বা প্রতিকূল আইনি-বিধির সংজ্ঞা থেকে মানুষ তার উদ্দেশ্য, তার আচরণ বা যৌক্তিকতার নির্দিষ্ট গতি সম্পর্কে জানতে পারে। আইন-লঙঘন করার যে সংজ্ঞা তার পছন্দ হয় তার ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি অপরাধী বা দুষ্ক্রিয় হয়ে যায়। একেই সাদারল্যান্ড বলেছেন ''differential association'' বা পার্থক্যমূলক সংঘ। এই তত্ত্ব অন্যান্য মানুষের সঙ্গে অপরাধীর মানসিক প্রভেদকে নির্দেশ করে, এবং আইন মেনে চলা মানুষের মতো অপরাধীদেরও একই ধরনের চাহিদা ও মূল্যবোধের কথা বলে।

সাদারল্যান্ডের এই তত্ত্বকে সামান্য পরিমার্জনা করেন অপর একজন তাত্ত্বিক, তাঁর নাম ড্যানিয়েল গ্লেসার (Daniel Glaser; 1956)। গ্লেসার সাদারল্যান্ডের ''Differential Association'' বা 'পার্থক্যমূলক সংঘ' নামক তত্ত্বকে পরিবর্তন করে তার নাম দেন ''Differential Identification Theory'' (পার্থক্যমূলক পরিচিতি তত্ত্ব)। গ্লেসারের মতে, সাদারল্যান্ডের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ছিল। অপরাধমূলক কাজকর্মে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে গেলেই কোন মানুষ যে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই। গ্লেসার (Glaser) তাঁর নতুন তত্ত্বে বললেন, কোন মানুষ অন্য মানুষের অপরাধমূলক আচরণকে ততক্ষণ পর্যন্তই অনুসরণ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ বাস্তব বা কাল্পনিক মানুষটির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পারবে। এই মানুষটির দিক থেকেও প্রথম মানুষটির অপরাধ-প্রবণ কাজকর্মকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে।

(খ) অপরাধের জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজতত্ত্ববিদ্ রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) ''আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউ'' (American Sociological Review) নামক পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত একটি আলোচনা পত্রে অপরাধমূলক আচরণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। মার্টন তাঁর তত্ত্বকে আরও সংশোধন ও বিস্তৃত করে Anomic বা বিধিশূন্যতার তত্ত্ব নামে অপরাধ ও বিচ্যুতির একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব নির্মাণ করেন। এখানে উল্লেখ্য anomic বা বিধিশূন্যতার ধারণাটি কিন্তু মার্টনের উদ্ভাবন নয়, এই ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ এমিল দ্যুরখাইম (Emile Durkheim)। দ্যুরখাইম তাঁর বিখ্যাত ''suicide'' এর তত্ত্বে বিধিশূন্যতার কথা বলেন। তাঁর মতে, আধুনিক সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে আচরণকে পরিচালনা করতে যদি সুস্পষ্ট কোন মানদণ্ড না থাকে, তাহলে anomic বা বিধিশূন্যতা বিরাজ করে। এরকম অবস্থায় জনগণ দিশাহারা হয়ে পড়ে। ফলে বিধিশূন্যতা হল এমন একটি সামাজিক অবস্থা যা মানুষকে আত্মহননে প্রবৃত্ত করে। মার্টনের মতে, যখন গৃহীত নিয়মনীতির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন ব্যক্তির আচরণে হৃদয়হীনতা সৃষ্টি হয় এবং তার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে অপরাধ-প্রবণ করে তোলে। প্রতিটি সমাজে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত সমাজে মানুষের বস্তুগত সাফল্যের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সাফল্য অর্জন করার জন্যে সমাজ-অনুমোদিত আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছক প্রতিটি সমাজের আদর্শ-কাঠামো এমনটাই চায়। কিন্তু সমস্যা হল, এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে সমাজ-অনুমোদিত উপায় বা সুযোগ-সুবিধা সকলের কাছে সমানভাবে সুলভ নয়। এই অবস্থায় লক্ষ্য (goal) ও উপায়ের (means) প্রাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তখন তা ব্যক্তির মনের ওপর এক ধরনের চাপ তৈরি করে এবং বিধিশূন্যতা বা Anomic সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যক্তি যে কোন উপায়ে বা অ-বিধিসম্মতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করে। মার্টনের মতে, এই সময় মানুষ অপরাধ বা বিচ্যুতির পথ বেছে নেয়। তাই বিচ্যুতি বা অপরাধকে সমাজে বিদম্যান অসাম্য বা inequality-র ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে।

মার্টন (১৯৬৮) সমাজ-অনুমোদিত লক্ষ্য, এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার সীমাবদ্ধ উপায়ের ফলে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তার পাঁচটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে চিহ্নিত করেছেন অনুসরণ (Conformity), উদ্ভাবন (innovation), রীতিসিদ্ধতা (ritualism), পশ্চাদপসরণ (retreatism) এবং বিদ্রোহ (rebellion)।

(গ) মার্টনের পর অপর দুজন সমাজবিজ্ঞানী এ. ক্লোয়ার্ড এবং লয়েড ই. ওহলিন (A. Cloward and Lyod E. Ohlin) অপরাধমূলক আচরণের একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে তোলেন। এই তত্ত্বকে বলা হয় ''পার্থক্যমূলক সুযোগ''-এর তত্ত্ব (Theory of Differential Opportunity ; 1960)। প্রকৃতপক্ষে, এই তত্ত্ব হচ্ছে সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্বের সমন্বিত রূপ। ক্লোয়ার্ড এবং ওহলিন সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর বৈধ ও অবৈধ উপায়ের পার্থক্যের কথা তাঁর তত্ত্বে বলেন। ১৯৬০ সালে অপরাধপ্রবণ শিশু নিয়ে তিনি যে সমীক্ষা-নির্ভর গবেষণা চালান, তাতে এঁরা দেখেন যে দুর্বৃত্ত বা অপরাধীরা গড়ে ওঠে মূলত সমাজের উপসংস্কৃতি (sub-culture) থেকে। বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষাপটে যেখানে মানুষের সাফল্য লাভের সুযোগ কম, সেখানে কিছু মানুষ বৈধভাবে লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, আবার কিছু মানুষ অবৈধ উপায় অবলম্বন করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে চান। তাঁদের তত্ত্বের মাধ্যমে ক্লোয়ার্ড ও ওহলিন তিন ধরনের বিচ্যুতিমূলক উপসংস্কৃতিকে (delinquent subculture) চিহ্নিত করেছেন, যেমন— criminal (অপরাধী), Conflictory (সংঘাতকারী) এবং Retreatist (পশ্চাদপসরণকারী)।

(ঘ) অপরাধ সংক্রান্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল বেকারের (Becker : 1963). 'Labelling Theory' বা 'চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব'। বেকারের আগে এডউইন লেমেন্ট (Edwin Lement : 1951)

ও এরিসন (Erikson : 1962) 'সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিভঙ্গী'' বা ''Social Interaction Approach'-র মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে বেকারের তত্ত্ব কখনোই এই প্রশ্ন উত্থাপন করে না কেন একজন মানুষ অপরাধী হল? বরং কেন সমাজ একজন মানুষকে অপরাধী বা দুষ্ক্রিয় বলে চিহ্নিত করছে— চিহ্নিতকরণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সেটাই। বেকার তার তত্ত্বের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কাজ বা দুষ্ক্রিয়তা ততটা বিবেচ্য বিষয় নয়; তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সামাজিক অনুমোদন (Sanction) ও নিয়ম-নীতির নিরিখে এই বিষয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়া। সমাজতত্ত্বে ''চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব'' বা 'Labelling theory' একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরে, যদিও এই তত্ত্ব এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতার জন্যে বিরুদ্ধ-সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

১.৫ ভদ্রলোকের অপরাধ (White-Collar Crime)

আগের অনুচ্ছেদেই আমরা জেনেছি আমাদের সমাজে সাধারণত তিন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়; যেমন হিংস্র বা চরম অপরাধ (Violent Crime), অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধ (Property Crime) এবং ভদ্রলোকের অপরাধ বা বাবু-অপরাধ (White-Collar Crime)। অপরাধের শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে তৃতীয় বা শেষ ধরনের অপরাধকে ''ভদ্রলোকের অপরাধ'' বলে নির্দিষ্ট করা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে 'White-Collar Crime' এই শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এডউইন এইচ. সাদারল্যান্ড (Edwin H. Sutherland) ১৯৪৫ সালে। বাংলাভাষায় অপরাধের এই ধরনটিকে আমরা 'বাবু-অপরাধ' বা 'ভদ্রলোকের অপরাধ' বলে অভিহিত করি। সাদারল্যান্ড 'White-Collar Crime' বলতে বড় বড় বাণিজ্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে অসত্য বিজ্ঞাপন, কপিরাইট লঙ্ঘন করা, অসাধু প্রতিযোগিতা, প্রতারণা, অন্যায়ভাবে কাজ করানো এবং অবশ্যই ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া। সাদারল্যান্ড-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ভদ্রলোকদের অপরাধ' আমরা আমাদের সমাজেও প্রায়ই দেখতে পাই। তবে তার মধ্যে শুধু বৃহৎ বাণিজ্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরাই ''ভদ্রলোক অপরাধী'' বলে চিহ্নিত হন না। প্রতারণা, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ঘুষ নেওয়া, অবৈধ উপায়ে নিজের সম্পত্তি বাড়ানো এই সমস্ত কাজে যারা লিপ্ত থাকেন, তারা আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। শিল্প-সংস্কৃতি-খেলাধূলা ও বিশেষভাবে রাজনৈতিক জগতের অনেক মানুষকে 'ভদ্রলোকের অপরাধ' নামক অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকতে দেখা যায় ও সংবাদপত্রের পাতায় এদের নাম আমাদের চোখেও পড়ে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এই 'বাবু' বা 'ভদ্রলোকের অপরাধ' কি অন্য অপরাধের মতো একই শ্রেণীভুক্ত? এর উত্তরে বলা যায়, অনেকে মনে করেন এই অপরাধ সাধারণ অপরাধের সমগোত্রীয় নয়। তবে আইন লঙ্ঘনকারী যে কোন কাজই হচ্ছে অপরাধ। তবে সাধারণ অপরাধ ও ভদ্রলোকের অপরাধের মধ্যে তিনটি পার্থক্য অবশ্যই নির্দেশ করা যায় ঃ

(১) সাধারণত ভদ্রলোকের অপরাধ সংঘটিত হলে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ-হানি না ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়;

(২) ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি চরম বা হিংস্র অপরাধের (Violent Crime) প্রকৃতি থেকে ভদ্রলোকের অপরাধের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; এবং

(৩) চরম বা অর্থনৈতিক কারণ জনিত অপরাধের মতো ভদ্রলোকের অপরাধের প্রভাব সমাজস্থ ব্যক্তিদের ওপর তেমন প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

১.৬ কিশোর অপরাধ (Juvenile Delinquency)

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'কিশোর অপরাধ' বর্তমান সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সমাজে কিশোর অপরাধ ও তজ্জনিত সমস্যা অতীতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আধুনিক সমাজে কিশোর অপরাধীর সংখ্যা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া বিগত শতকের কয়েক দশক ধরে সংঘটিত কিশোর অপরাধের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে দারিদ্র্য, অভাব বা মনস্তাত্ত্বিক কারণের ফলেই কিশোররা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে না। অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়াও এইসব কিশোর অপরাধের ঘটনা ঘটছে তাই, আধুনিক সমাজে সমাজতাত্ত্বিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। কেন ঘটছে কিশোর অপরাধ এবং এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই বা কী—এই বিষয়ে আলোচনা প্রবেশ করার আগে আমাদের জানা দরকার 'কিশোর অপরাধ' কাকে বলে?

সাধারণত, পরিণতবয়স্ক নয় এবং যাদের বয়সসীমা ৭ থেকে ১৬ কিংবা ১৮-এর মধ্যে, তারা যখন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তাদেরকেই 'কিশোর অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই বিষয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে। ১৯৮৬ সালের ''Juvenile Justice Act'' অনুসারে বলা হয় কিশোর অপরাধীর বয়স হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। কিন্তু এর আগে ''Children Act'' অনুযায়ী এই বয়সসীমার অনুপাত সব রাজ্যে সমান ছিল না। যেমন উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে কিশোর-অপরাধীর বয়স-সীমা ছিল ১৬ বছর এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে ছিল ১৮ বছর। কর্ণাটক, অসম ও রাজস্থানে ছেলে অপরাধীর বয়স সীমা ছিল ১৬ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। অবশ্য অপরাধের প্রকৃতি ছিল একই রকম।

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে Juvenile delinquency বা কিশোর অপরাধ হল এক প্রকার বিচ্যুতিমূলক আচরণ, যা সমাজব্যবস্থার সর্বজনীন বৈধ ও প্রত্যাশিত আচরণের বিরোধী। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার কিশোররা যখন এমন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যা সমাজ-অনুমোদিত আদর্শ-আচরণকে লঙঘন করে, তখন আমরা তাকে 'কিশোর অপরাধ' বলে অভিহিত করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, এগুলি হল কিশোর অপরাধ।

১.৬.১ কিশোর অপরাধ ঃ ভারতবর্ষের ছবি

আজকের ভারতীয় সমাজে কিশোর অপরাধ অন্যান্য সামাজিক অপরাধের তুলনায় ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করছে। নব্বই দশকে সমীক্ষিত ''ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া''র (Crime in India) রিপোর্টে প্রকাশ ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code) আওতায় কিশোর অপরাধের যেসব ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, তার বেশির ভাগ ঘটেছে অর্থনৈতিক কারণে, যেমন—চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এই একই ধরনের অপরাধের সংখ্যা বয়স্ক দুষ্কৃতী-কৃত অপরাধের তুলনায় কিশোর অপরাধীর মধ্যে বেশি মাত্রায় ঘটেছে। সংখ্যাগত হিসেবে তা ৯.৭ শতাংশ বেশি। ঐ একই দশকের সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক কারণ জনিত কিশোর অপরাধ ছাড়াও ৭.৪ শতাংশ কিশোরকে দাঙ্গা বাধানোর কারণে, ৩.৪ শতাংশকে খুনের জন্যে, ২.১ শতাংশকে ধর্ষণের কারণে এবং ২ শতাংশকে অপহরণের দায়ে 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আশির দশকে কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে কিশোরীদের তুলনায় কিশোরদের সংখ্যা বেশি ছিল। কিশোর-অপরাধীর বয়সগত সীমারেখার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হওয়ার পর নব্বই দশকে কিশোরী অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

'Crime in India'-র ১৯৯৪ সালে প্রদত্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে, বয়ঃসন্ধি কালের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১২-১৪ বছরের মধ্যে কিশোর অপরাধের হার বেশি।

দ্বিতীয়ত, কিশোর অপরাধ প্রধানত একটি নগর-কেন্দ্রিক ঘটনা। তাই গ্রামের তুলনায়, এমনকি ছোট শহরগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের বড় শহরগুলিতে কিশোর অপরাধের ঘটনা বেশি ঘটে, যেমন—দিল্লী, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পুনে, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শহরে।

তৃতীয়ত, পরিবার-বিচ্ছিন্ন কিশোরদের তুলনায় পরিবারে পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাসকারী কিশোরদের মধ্যে, দেখা গেছে, অপরাধ প্রবণতা বেশি।

চতুর্থ, 'Crime in India'-র রিপোর্টে আরও দেখা গেছে অশিক্ষিত কিশোরদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। যেমন—২৯.৬ শতাংশ কিশোর একেবারে নিরক্ষর, ৪৩.৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, ২১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং মাত্র ৫.৫ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করেছে।

পঞ্চমত, ভারতবর্ষে কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খারাপ অবস্থা।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-দুষ্কৃতীর (gang delinquents) সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু আমেরিকায় এই ধরনের কিশোর অপরাধের হার, তুলনায়, অনেক বেশি। তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—আমাদের দেশেও কিশোর অপরাধের ঘটনার পেছনে অনেক বড় বড় চক্রের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকে।

১.৬.২ কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে, নানা গবেষণায় ও সমীক্ষায় দেখা গেছে, নানা কারণ সক্রিয় থাকে। এই কারণগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) ব্যক্তিগত কারণ এবং (২) সামাজিক কারণ।

১। ব্যক্তিগত কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় তার মধ্যে অনেকগুলি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান নিহিত হয়েছে, যার ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটি কিশোর কোন কিছুর প্রভাবে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া, কোন কিশোর আত্মবিশ্বাসের অভাব, আবেগের সংঘাত, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা অথবা প্রচণ্ড ক্রোধ, লোভ, অভিমান বা স্নেহ-ভালবাসা-নির্ভরতার অভাবের কারণে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে। এরকম ঘটনা খুব কম হলেও, দেখা যায় নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বা adventure-এর লোভে কিশোররা অপরাধের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

২। সামাজিক কারণের মধ্যে দেখা যায় পরিবারের ভূমিকা, সঙ্গীসাথীদের এবং প্রতিবেশীদের প্রভাব এবং চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের প্রভাব—কিশোর অপরাধীর মানসিকতা তৈরি করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

আমরা জানি, সমাজতত্ত্বের আলোচনায় পরিবার একটি বড় ভূমিকা পালন করে। পরিবারের এই গুরুত্বের জন্যে মানব-জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারকে 'প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ' বলা হয়। শিশুর মানসিক বিকাশ ও সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় 'পরিবার'-এর মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু নগরায়ন ও শিল্পায়নের পথ ধরে যে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবার-ব্যবস্থাকে গ্রাস করছে, তার প্রভাবে পরিবার-ব্যবস্থা অতীত দিনের মতো স্থায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার 'ভাঙনের' শিকার হয়েছে। এই ভগ্ন-পরিবার (broken home) শিশু ও কিশোরদের নিরাপত্তা, স্নেহ ও ভালবাসা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের 'সামাজিকীকরণ' (Socialisation) বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে খুব সংগতভাবেই নিরাপত্তাহীনতা হয়তো জীবনের

কোন অন্ধকার দিক, নেতিবাচক দিকের প্রতি শিশুকে চালিত করতে পারে। এই ছবি সুলভ বড় বড় শহরে নগরে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সঙ্গীসাথীরা। বিশেষ করে ব্যক্তির বয়ঃসন্ধিকালে। সঙ্গীসাথীদের প্রভাব শিশু ও কিশোরের মানসিকতাকে গড়ে তোলে, গড়ে তোলে মূল্যবোধও। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভাল বন্ধুর সাহচর্য একজন শিশু ও কিশোরকে যেমন ভালভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি কু-সংসর্গ তাকে নানা অন্যায় বা অবৈধ কাজকর্মের দিকে আকর্ষণ করে। ভাল-মন্দ বিচার করার পরিণত মানসিকতা না থাকার জন্যে অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা চালিত হয়। কিশোর অপরাধের নানা ঘটনায়, দেখা গেছে, অনেক সময়েই বন্ধুর পরামর্শ বা সাহায্য পরোক্ষভাবে একজন অপরাধীকে ইন্ধন যুগিয়েছে। এছাড়া, একই বিষয় পরিলক্ষিত হতে পারে প্রতিবেশীর প্রভাবের ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের দেখা যায় বড় বড় শহরগুলির বস্তি অঞ্চল বা মহল্লায় অনেকটা সময় কাটাতে প্রতিবেশীর ঘরে। অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত কোন প্রতিবেশীর বাড়ির পরিবেশ শিশু ও কিশোরদের অপরিণত মানসিকতার ওপর ছাপ ফেলতে পারে।

পরিশেষে, বর্তমান কালে কিশোর অপরাধের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল গণমাধ্যম, বিশেষত, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্রের খারাপ প্রভাব। জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি ছবিতে হিংসা ও যৌনতার অবাধ প্রদর্শন শিশু ও কিশোরদের মনকে সহজেই প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে অপহরণ, চুরি, ছিনতাই এইসব ঘটনায় জড়িত অপরাধীরা যেসব কৌশল অনুসরণ করেছে—তা চলচ্চিত্রের 'ব্যাড ম্যান'-এর অনুসৃত কৌশল। এছাড়া আছে দূরদর্শনে প্রদর্শিত নানা ধরনের বিজ্ঞাপন—যা ভোগবিলাসী জীবনযাত্রার দিকে তাদের আকৃষ্ট করছে। গত শতকের শেষ দশক থেকেই গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেকটা আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে। চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনের ভাষা আজকের সমাজে অন্যরকম একটা রুচি ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

১.৭ সমস্যা সমাধানের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধ দমনের জন্যে আমাদের দেশে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে—তার উত্তরাধিকার সূত্রটি থেকে গেছে অতীত দিনের ব্রিটিশ প্রশাসনের মধ্যে। ১৮৭৬ সালে প্রণীত ''Reformatory Schools Act''-এর মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে কিশোর অপরাধ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন অনুসারে পনের বছরের কম বয়স্ক কোন কিশোর অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে আদালত কোন Reformatory School বা সংশোধন স্কুলে তিন থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত রাখার নির্দেশ দিতে পারবে। পরবর্তীকালে ভারতীয় জেল-কমিটি রিপোর্ট, ১৯১৯-১৯২০ (Indian Jails Committee Report, 1919-1920) অন্যান্য অপরাধীদের তুলনায় তরুণ বয়স্ক অপরাধীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি গ্রহণের ও পৃথক বিচার ব্যবস্থা স্থাপনের সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী, মাদ্রাজ, বাংলা ও বোম্বাইতে যথাক্রমে ১৯২০, ১৯২২ ও ১৯২৪ সালে কিশোরসংক্রান্ত আইন (Childrens Act) পাস করে তরুণ ও অপরিণত বয়স্ক অপরাধীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও পুনর্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে কিশোর-অপরাধীদের বিষয়গুলিকে বিবেচনা করার যে ধ্যান-ধারণা ব্রিটিশদের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেই ধ্যান-ধারণাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষ দিকে ভারতবর্ষেও প্রসারলাভ করে।

এরপর বিংশ শতকে কিশোর অপরাধ-বিষয়ক যে সমস্ত নিয়মকানুন তৈরি হয়, দেখা যায় তার সব কটির উৎস কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে ব্রিটেনে প্রচলিত কিশোরসংক্রান্ত আইনসমূহ (English Children Acts)।

স্বাধীন-ভারতে ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকার কিশোর-বিষয়ক আইন (Children Act) পাস করে। এই আইন অনুসারে অপরাধী কিশোরদের বিচারের ভার দেওয়া হয় Juvenile Court বা কিশোর অপরাধসংক্রান্ত আদালতের ওপর। পরে ১৯৭৮ সালে গৃহীত এক সংশোধনী দ্বারা ১৯৬০ সালের এই আইনটিকে আরও শক্তিশালী ও উদার করে তোলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের আগে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই অনুসারে Child Welfare Board বা শিশু কল্যাণ পর্ষদের অধীনে অবহেলিত কিশোরদের এবং কিশোর-আদালতের (Juvenile Court) আয়ত্তাধীন অপরাধী কিশোরদের আদালত বা পর্ষদ দ্বারা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত একসঙ্গে ই 'Observation Home' বা পর্যবেক্ষণ গৃহে রেখে দেওয়া হত। এছাড়া, এই সময়ে আদালত থেকে পর্ষদে অথবা পর্ষদ থেকে আদালতে কোন মামলা স্থানান্তর করা যেত না। ১৯৭৮-এর সংশোধনী দ্বারা নিয়ম করে দেওয়া হয়—যেসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ছাড়া প্রাথমিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে অপরাধকর্ম কোন ক্রমেই অবহেলার সঙ্গে যুক্ত নয়, সেই সব ক্ষেত্রে মামলা স্থানান্তর করা যাবে। বিচারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্রুততা আনা এবং পর্যবেক্ষণ গৃহ বা Observation Home-এ বসবাসের সময়কালকে হ্রাস করাই ছিল এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৭৮ সালের সংশোধনীসহ ১৯৬০ সালের আইনটি সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত হলেও কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা, পরিধি বা অপরাধীর বয়স—ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যে একই নিয়মপ্রণালী অনুসৃত হত না। এছাড়া, সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল সব রাজ্যে পর্যাপ্ত কিশোর-আদালত না থাকা। এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের আদালতেই কিশোর অপরাধের বিচার হত। এই সব সমস্যা ও অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 'Juvenile Justice Act' বা 'কিশোরদের জন্যে ন্যায়নীতির আইন-টি পাশ করে। (ক) এই আইনটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটির দ্বারা 'অবহেলিত কিশোর' ও 'কিশোর অপরাধীর' মধ্যে পার্থক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা হয়। (খ) 'অবহেলিত কিশোর' যারা নিপীড়ন, অপব্যবহারের শিকার এবং অপরাধমূলক কাজকর্মে যাদেরকে প্রবৃত্ত করানো হয়েছে—এই নতুন আইন অনুসারে তাদেরকে Observation Home বা পর্যবেক্ষণ গৃহে রাখার কথা বলা হয়। অন্যদিকে, 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত কিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে কোন অবস্থাতেই বন্দী রাখা চলবে না। (গ) এই আইনে আরও বলা হয়েছে—কিশোর অপরাধীরদের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর ধরতে হবে। (ঘ) অবহেলিত কিশোরদের শিশু কল্যাণ পর্ষদ বা Juvenile Welfare Board-এ পাঠাতে হবে এবং শিশু/কিশোর অপরাধীদের Juvenile Court বা কিশোর-আদালতে প্রেরণ করতে হবে।

১৯৮৬ সালের আইনটিকে পশ্চিমবঙ্গেও চালু করা হয়েছে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে। তবে শুধু আইন প্রণয়নই নয়, অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। মেয়েদের জন্যে সল্ট লেকে ''হোম অফ দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ উইমেন'' এবং লিলুয়ায় ''এস. এস. হোম'', ছেলেদের জন্যে বারাসাতে 'কিশলয়', আড়িয়াহে 'ধ্রুবাশ্রম'—সরকার পরিচালিত এই কটি পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক আবাসের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এছাড়া, নানা ধরনের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা ভারতবর্ষে বিভিন্নরাজ্যে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে,

সেগুলি হল—রেমান্ড হোমস্ (Remand Homes), সার্টিফায়েড স্কুলস্ (Certified Schools), বরস্ট্যাল স্কুলস (Borstal Schools), প্রবেশন হস্টেলস্ (Probation Hostels) এবং রিফর্মেটরী স্কুলস্ (Reformatory Schools)।

১.৮ সারাংশ

এই এককে সামাজিক সমস্যা-বিষয়ক আলোচনায় আমরা অপরাধ ও বিচ্যুতি সম্পর্কে জানলাম। সাধারণ ক্ষেত্রে অপরাধ বলতে বোঝায় আইন-বিরুদ্ধ বা অ-সামাজিক কাজকর্মকে। আবার, অপরাধ বলতে সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকেও বোঝানো হয়। তবে যে কোন ধরনের বিচ্যুতিই কিন্তু অপরাধমূলক কাজ নয়। বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এইসব বিভিন্ন সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি—অপরাধ হচ্ছে সমাজস্থ গোষ্ঠীর আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতি এবং অপরাধ অবশ্যই আইন লঙঘনকারী ও অ-সামাজিক কাজ। নানা কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। কখনও অতিমাত্রায় লোভ ও আকাঙক্ষা, কিংবা দারিদ্র্য বা সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের কারণে মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয়। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও মানুষ অপরাধপ্রবণ হতে পারে। মূলত অপরাধের কারণগুলিকে-ব্যক্তিগত ও সামাজিক—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অপরাধ কেন ঘটে কিংবা কী কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা ধরনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলি চারপ্রকার, যেমন—ধ্রুপদী তত্ত্ব, জৈবিক তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব। কোন একক তত্ত্বের মাধ্যমে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হয়। তবে 'অপরাধের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Crime) নামে যে একটি স্বতন্ত্র আলোচনার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলিই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। এডউইন. এইচ. সাদারল্যান্ড তাঁর ''Differential Association'' বা ''পার্থক্যমূলক সঙঘ'' বিষয়ক তত্ত্বের মাধ্যমে পরিবেশ বা পরিস্থিতি (situational) ও বংশগত (genetic) দুটি কারণকে নির্দেশ করেছেন অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে। তবে তিনি নিজে genetic বা 'বংশগত' কারণকেই গ্রহণ করেছেন। অপর একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) 'Anomic' বা বিধিশূন্যতার তত্ত্ব নামে একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব নির্মাণ করেন। মার্টনের মতে সমাজে যখন গৃহীত নিয়ম-নীতির সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়—তখন ব্যক্তির আচরণে হৃদয়হীনতা সৃষ্টি হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। সমাজে সব মানুষই বস্তুগত সাফল্য লাভ করতে চায়। কিন্তু সমস্যা হল এই সাফল্য অর্জন করার জন্যে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় এবং এক্ষেত্রে সমাজ-অনুমোদিত সুযোগ-সুবিধা সকলের কাছে সমভাবে লভ্য নয়। তাই লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে সমতা থাকে না। এই বিষয়টি ব্যক্তির মনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তারই ফলশ্রুতিতে Anomic বা বিধিশূন্যতা তৈরি হয়। সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্বকে অপর দুজন সমাজবিজ্ঞানী এ ক্লোয়ার্ড এবং এল. ই. ওহলিন সমন্বিত রূপ দেন এবং এঁরা দুজনে ''পার্থক্যমূলক সুযোগ-এর তত্ত্ব (Theory of Differential Opportunity) গড়ে তোলেন। আলোচ্য তত্ত্বের মাধ্যমে ক্লোয়ার্ড ও ওহলিন তিনধরনের বিচ্যুতিমূলক উপসংস্কৃতিকে (delinquent sub-culture) চিহ্নিত করেন। যেমন অপরাধী বা Criminal, সংঘাতকারী বা Conflictory, পশ্চাদপসরণকারী বা Retreatist। অপরাধ-বিষয়ক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল বেকারের 'চিহ্নিতকরণ তত্ত্ব' বা Labelling Theory। এই তত্ত্বের মূল বিষয় হল সমাজ কেন একজন মানুষকে অপরাধী বা দুষ্কৃতি বলে চিহ্নিত করছে তা অনুসন্ধান করা। আমাদের সমাজে সাধারণত তিনি ধরনের

অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায় যেমন হিংস্র অপরাধ, অর্থনৈতিক কারণে অপরাধ এবং ভদ্রলোকের অপরাধ। হত্যা, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি হল হিংস্র অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুট এগুলি হল অর্থনৈতিক অপরাধ। এছাড়া, ঘুষ নেওয়া, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া, অবৈধভাবে সম্পত্তি বাড়ানো এগুলি হল ভদ্রলোকের অপরাধ বা বাবু অপরাধ। এছাড়া, ৭ থেকে ১৬ বা ১৮ বছর বয়সী শিশু ও কিশোরদের মধ্যেও নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা যায়—তাকে বলে কিশোর অপরাধ। ভগ্ন পরিবার, পিতা-মাতার হৃদয়হীনতা, নিরাপত্তার অভাব, খারাপ পরিবেশ কিংবা ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্যে অনেক কিশোর সুকুমার বয়সেই নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হয়। যে কোন সমাজেই এই ধরনের অপরাধ একটি গভীর সমস্যা। সরকারি তরফে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, এই সমস্যা নিবারণের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে কল্যাণকর নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও। পরিবারকেও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মতো আবশ্যিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

১.৯ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)

১। সমাজে অপরাধ কেন সংঘটিত হয় তার কারণগুলি আলোচনা করুন।

২। অপরাধের জৈবিক তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৩। অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৪। অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের মধ্যে সাদারল্যান্ড ও মার্টনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৫। কিশোর অপরাধের কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৬। ভারতে কিশোর অপরাধ দমন করার জন্যে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)

১। অপরাধ-জনিত আচরণের ক্ষেত্রে রবার্ট কে. মার্টনের বিধিশূন্যতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। অপরাধ-জনিত আচরণের ক্ষেত্রে সাদারল্যান্ডের পার্থক্যমূলক সংঘের ধারণাটি আলোচনা করুন।

৩। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে কিশোর-অপরাধের প্রকৃত ছবিটি কেমন?

৪। কিশোর অপরাধ সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে পরিবার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা কতটা সক্রিয় বলে আপনি মনে করেন?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (প্রতিটি ৬ নম্বর)

১। অপরাধের সংজ্ঞা দিন।

২। ভদ্রলোকের অপরাধ বলতে কী বোঝায়?

৩। চিহ্নিতকরণ তত্ত্বের প্রবক্তা কে? এই তত্ত্বের মূল বিষয়টি কী?

৪। কিশোর-অপরাধ কাকে বলে?

৫। বেকারিয়া তাঁর ''ধ্রুপদী তত্ত্বে'' কোন বিষয়গুলি ওপর জোর দিয়েছিলেন?

৬। সাধারণ অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে কী কী বিষয়ে পার্থক্য আছে?

৭। ''জুভেনাইল জাস্টিস'' আইনটির বিশেষত্ব আলোচনা করুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—স্যোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯৯।

২। বেকার হাওয়ার্ড. এস—সোশ্যাল প্রব্লেমস্, এ মডার্ন অ্যাপ্রোচ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৬।

৩। দত্তগুপ্ত বেলা—কনটেমপোরারি সোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৪।

৪। গিবনস্ ডি. সি—ডিভিয়্যান্ট বিহেভিয়ার, প্রেন্টিস্ হল, ১৯৭৬।

৫। মার্টন আর. কে— সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার, দি ফ্রি প্রেস, ১৯৫৭।

৬। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু—প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব, দ্রষ্টব্য অধ্যায়—''সমাজ সমীক্ষণ''—''কিশোর অপরাধ'', পৃষ্ঠা ৪৪৭।

একক ২ ❑ শিশু অপব্যবহার

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ শিশু অপব্যবহার ঃ সংজ্ঞা

২.৩.১ শিশু অপব্যবহারের ধরন

২.৩.২ অপব্যবহারের শিকার ঃ কন্যাশিশু

২.৩.৩ শিশু অপব্যবহারের কারণ

২.৩.৪ শিশু অপব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ

২.৪ শিশু শ্রম

২.৪.১ শিশু শ্রমের সংজ্ঞা

২.৫ শিশু শ্রমের কারণ

২.৬ কন্যা শিশু শ্রমিক ঃ বাস্তব চিত্র

২.৬.১ শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র

২.৬.২ শিশু শ্রমিক ঃ কাজের পরিবেশ

২.৭ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সরকারি পদক্ষেপ

২.৭.১ শিশু শ্রম ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি

২.৮ সারাংশ

২.৯ অনুশীলনী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

মানবসমাজে শিশুর ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে একটি প্রবচনের মাধ্যমে—"Today's Child is tomorrow's citizen" অর্থাৎ আজকের শিশু হচ্ছে দেশের ভাবীকালের নাগরিক। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ হল শিশু। ভারতবর্ষেও আমরা দেখি জনগণনার হিসাবে শিশু হল মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ (১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে)। মানুষের জীবনের প্রথম ধাপ হল শৈশবকাল।

সাহিত্যে, প্রবচনে জীবনের এই মূল্যবান সময়কালকে নানাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়— জীবনচক্রের প্রাথমিক সোপান শৈশবকাল মানুষের কাছে মূল্যবান এবং শিশুরা দেশের ভাবী প্রজন্ম বলে স্বীকৃতি পেলেও আমাদের সমাজে শিশুরা আজও নানা ধরনের অবজ্ঞা, অযত্ন, নিপীড়ন ও সর্বোপরি অপব্যবহারের শিকার। ফলে কলকারখানায়, জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে নিয়োগ করা হয়। অর্থনৈতিক কারণে শিশু ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কন্যাশিশুকে পাচারচক্রের শিকার হয়ে সুকুমার বয়সেই অন্ধকার জগৎকে খুঁজে নিতে হয়। ফলে শিশু অপব্যবহার ও শিশু শ্রমের বিষয়টি আমাদের সমাজে একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

২.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে আপনি যে বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, সেগুলি হল—

- ✪ শিশু অপব্যবহার বলতে কী বোঝায়?
- ✪ শিশু অপব্যবহারের বিভিন্ন ধরন—
- ✪ শিশুকে কেন বা কী কারণে এইভাবে অপব্যবহারের শিকার হতে হয়—
- ✪ শিশু শ্রম কাকে বলে?
- ✪ শিশু শ্রমের কারণগুলি কী কী?
- ✪ শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র।
- ✪ শিশু শ্রম প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থা।

২.৩ শিশু অপব্যবহার ঃ সংজ্ঞা

বিভিন্ন তাত্ত্বিক ''Child Abuse'' বা ''শিশু অপব্যবহারের'' বিষয়টিকে নানা দিক থেকে দেখেছেন এবং নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু অপব্যবহারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেম্প অ্যান্ড কেম্প (Kemp and Kemp : 1978) শিশু অপব্যবহার বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি অবস্থা যেখানে শিশুকে ইচ্ছাকৃত শারীরিক নিপীড়নের দরুন আহত হতে হচ্ছে। অন্যদিকে গার্ডেন অ্যান্ড গ্রে (Garden and Gray, 1982) বলেছেন, দুর্ঘটনা ছাড়া ইচ্ছাকৃত শারীরিক আঘাত ও ক্ষত সৃষ্টি করা হয় যখন শিশুদের ওপর, তখন তাকেই Child Abuse বা শিশু অপব্যবহার বলা যাবে। বলা বাহুল্য, ওই ধরনের সংজ্ঞা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও অস্বচ্ছ, তাই সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি। এই সংজ্ঞার মধ্যে শুধু শারীরিক নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শিশুর প্রতি অযত্ন, অবহেলা কিংবা দুর্ব্যবহার ইত্যাদির বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সমাজবিজ্ঞানী আর. এল. বার্জেস (R. L. Burgess : 1997) শিশু অপব্যবহারের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশু অপব্যবহার বলতে বোঝায় অভিভাবক, পিতা-মাতা কিংবা নিয়োগকর্তা কাছ থেকে যখন শিশু দুর্ঘটনা-বহির্ভূত শারীরিক ও মানসিক আঘাত পাচ্ছে। বার্জেস-প্রদত্ত সংজ্ঞায় মৌলিক তিরস্কার দৈহিক নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শন এবং মাত্রাতিরিক্ত দৈহিক শাস্তিদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৩.১ শিশু অপব্যবহারের ধরন

সাধারণত শিশু অপব্যবহারকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যা থেকে আমরা তিন ধরনের শিশু অপব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি, যেমন—দৈহিক অপব্যবহার (Physical abuse), যৌন অপব্যবহার (Sexual abuse), এবং আবেগগত অপব্যবহার (emotional abuse)।

শিশুর ওপর ইচ্ছাকৃত দৈহিক নিপীড়ন, দেহে ক্ষত সৃষ্টি করাই হল দৈহিক অপব্যবহার। শিশু দেহে আঁচড়, কামড়, পোড়ার দাগ এগুলি হচ্ছে দৈহিক অপব্যবহারের চিহ্ন। দৈহিকভাবে নিপীড়িত বা অত্যাচারিত শিশুর আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অযথা ভয় পাওয়া, কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়া, অতি মাত্রায় লজ্জিত হয়ে পড়া কিংবা সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে না মিশে একলা থাকার চেষ্টা করা।

যৌন অপব্যবহারের বিষয়টি দৈহিক অপব্যবহারের সঙ্গেই জড়িত, তবুও অপব্যবহার নিয়ে আলোচনার সময় এই ধরনের অপব্যবহার স্বতন্ত্রতা দাবি করে। কেম্প বলেছেন, অপরিণত বয়স্ক ও নির্ভরশীল শিশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে সম্পর্ক বিষয়ে বোঝা বা সাড়া দেওয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়—যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে সম্পর্ক বিষয়ে বোঝা বা সাড়া দেওয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়—যৌন অপব্যবহার বা Sexual Abuse বলতে এই সম্পর্ককে বোঝান হয় (The involvement of dependent and immature children in sexual activities they do not fully comprehend, to which they are unable to give informed consent (Kemp 1978)। ১৯৮৬ সালে গৃহীত শিশুসংক্রান্ত আইন (Juvenile Justice Act) অনুসারে আমাদের দেশে ১৬ বৎসরের কম বয়সী ছেলে এবং ১৮ বৎসরের কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে যৌনাচার করা—'যৌন অপব্যবহার' হিসাবে অভিহিত হয়। দৈহিক অপব্যবহারের মতো যৌন অপব্যবহারকে শিশুর দেহের বিশেষ কোন চিহ্ন বা ক্ষতের মাধ্যমে বোঝা যায় না। তবে শিশুর হাঁটাচলার অসুবিধা বা দেহের গোপন স্থানে নখ বা দাঁতের দাগ দেখে অপব্যবহারের ঘটনাকে অনেক সময় বোঝা যায়। তবে আচরণগত কয়েকটি সূচক লক্ষ্য করা যায় যৌন অপব্যবহৃত শিশুর মধ্যে। বন্ধুদের সঙ্গে না মিশতে চাওয়া, কাজকর্মে অমনোযোগ বা অনিচ্ছা কিংবা অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া বা অপ্রয়োজনীয় ভাবে যৌন জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টা।

শিশু অপব্যবহারের অন্য একটি দিক হল আবেগগত অপব্যবহার। শিশুকে উপেক্ষা করা, তার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শন করা বা অবহেলা করা—এগুলি হল আবেগগত অপব্যবহারের প্রকাশ। এখানে উল্লেখ্য, শিশুর প্রতি অবহেলা বলতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় না দেওয়া, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। আবেগগত অপব্যবহার শিশুর সুকুমার মনে ভীষণভাবে দাগ কাটে, কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশুর মন হয় কোমল এবং অনুভূতিপ্রবণ। আবেগগত অপব্যবহারের ফলেও শিশুর নানারকম আচরণ জনিত অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যেমন—অকারণে ক্রুদ্ধ বা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা, বড়দের কথা না শোনা কিংবা শারীরিকভাবে তাদের আঘাত করা, ভয় পাওয়া বা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদি।

দৈহিক, যৌন এবং আবেগগত অপব্যবহার ছাড়াও শিশুরা আরও একধরনের অপব্যবহারের শিকার হয়, তা হল সামাজিক অপব্যবহার বা Social Abuse। সমাজতত্ত্বে শিশু অপব্যবহারের আলোচনায় এই সামাজিক অপব্যবহার হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। শিশু অপহরণ, শিশু শ্রম, শিশু পাচার, তাদের জোর করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা, শিশু-পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা—এগুলিকে আমরা শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক অপব্যবহার বলে অভিহিত করতে পারি। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, সামাজিক অপব্যবহার বলে অভিহিত করতে পারি। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, সামাজিক ও যৌন অপব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা পুত্র শিশুর তুলনায় কন্যাশিশুর ওপর নিপীড়নের ঘটনা বেশি দেখতে পাই। তাই শিশু অপব্যবহারের আলোচনায় কন্যাশিশু কিভাবে অপব্যবহারের শিকার হয় সে বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাত করা জরুরী। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা এই বিষয়ে জানব।

২.৩.২ অপব্যবহারের শিকার ঃ কন্যাশিশু

আগের অনুচ্ছেদেই আমরা উল্লেখ করেছি সামগ্রিক শিশু অপব্যবহারের ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা দু'ধরনের অপব্যবহারের সম্মুখীন হয়—(১) যৌন নির্যাতন এবং (২) সামাজিক অব্যবহার। রাজস্থানে নব্বই এর দশকে জি. এস. কেওয়ালরামানি (G. S. Kewalramani) ১০-১৬ বৎসরের ১৬৭ জন শিশুর ওপর যে সমীক্ষা করেন তাতে দেখা যায় মেয়েরা ছেলেদের থেকে বেশি পরিমাণে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে (অনুপাত হচ্ছে ২.৩ : ১)। এছাড়া, ছেলেদের ক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ ঘটেছে একজন ব্যক্তির দ্বারা, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেখানে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা যৌন উৎপীড়ন ঘটেছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে সুইডেনের স্টকহোমে সপ্তাহব্যাপী এক মহাসম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল শিশুদের ওপর যৌনপীড়ন বন্ধের দাবি জানানো। এইরকম একটি বিষয়ে বিশ্ব সম্মেলন এই প্রথম আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ১২৬টি দেশের প্রতিনিধি নিজের নিজের দেশের শিশুদের, বিশেষ করে কন্যাশিশুর ওপর সংঘটিত যৌন নিপীড়নের কথা তুলে ধরেন। তবে প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের অসুবিধার কথা বলেন।

দ্বিতীয়ত, শিশুকন্যা যেসব সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয় তার মধ্যে রয়েছে কন্যাশিশু পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ। 'সেন্টার অফ কনসার্ন ফর চাইল্ড লেবার'—এর রিপোর্ট অনুযায়ী কন্যাশিশু পাচারের সবচেয়ে বড় চারটি ঘাঁটি হল কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদ। এইসব শহর থেকে পাচার হয়ে আসা ছোট ছোট মেয়েদের নানা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে তাদের নিয়োগ করা হয় কোথাও ভিক্ষাবৃত্তিতে, কোথাও পরিচারিকার কাজে, আবার কখনও সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় পতিতালয়ে। এছাড়া, দেশের বাইরেও কন্যাশিশুকে পাচার করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ওখানে ভারতীয় শিশুকন্যার খুব চাহিদা আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে কন্যা শিশুদের যৌনবৃত্তি বা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়। এছাড়া, আরবে শিশুকন্যাদের উটের পিঠে বেঁধে দৌড়ের বাজি খেলান হয়। দিল্লির একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদনে এইরকম একটি ভয়াবহ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ছোট ছোট মেয়েগুলিকে উটের পিঠে বেঁধে চাবুক মারা হয়। চাবুক খেয়ে শিশুর বুকভাঙা আর্তনাদে উটগুলো দিশেহারা হয়ে যত ছুটবে আরবের শেখ্‌রা এই অমানবিক দৃশ্য দেখে ততই আনন্দ পাবে। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও পাকিস্তান এই কটি দেশের মধ্যে অবাধে কন্যাশিশু আদান-প্রদান হয়। ইউনিসেফ প্রকাশিত, ''প্রগ্রেস অফ নেশনস'' ১৯৯৬ অনুযায়ী ৪০ হাজার বাংলাদেশী শিশুকন্যা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মত পাকিস্তানেরও শিশু পাচারকারীদের মূল লক্ষ্য হল মধ্যপ্রাচ্য। পাকিস্তান হিউম্যান রাইটস কমিশনের (Pakistan Human Rights Commission) একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার পাকিস্তানি শিশুকন্যা সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে চালান করা হয়েছে। এদের বয়স ২ থেকে ১১ বৎসর। এদের বেশির ভাগকেই দাসী অথবা বিকৃত যৌন লালসার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, উটের দৌড়ের ''জকির'' কাজও করানো হয়েছে। ভয়ে, আতঙ্কে আর পরিশ্রমের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক শিশুর মারা যাবার মর্মান্তিক খবরও পাওয়া গেছে।

পরিশেষে, বলা যায়, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও এক বিশাল সংখ্যক শিশুকন্যা পাচার হয়ে আসে এবং যৌনবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ''সংলাপ''—এর সমীক্ষা অনুসারে, এরাজ্যে যেসব শিশু পাচার হয়ে আসে এবং পাচার হয়ে অন্য রাজ্যে যায় তারা বেশিরভাগ গ্রামের মেয়ে। বিভিন্ন জেলার মধ্যে এই বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

যেসব শিশুকন্যা এইভাবে পাচার হয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছে বা মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরিত হচ্ছে তার জন্যে কী কী বিষয় দায়ী? কেনই বা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ অজস্র শিশুকে আবেগগত বা দৈহিক অপব্যবহারের শিকার হতে হচ্ছে?—এই জরুরী ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের শিশু অপব্যবহারের কারণগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তিনরকমের শিশু অপব্যবহার এবং সর্বোপরি সামাজিক অপব্যবহারের পিছনে সক্রিয় কারণগুলি নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

২.৩.৩ শিশু অপব্যবহারের কারণ

ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে কেওয়ালরামানি যে সমীক্ষা করেন, তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে শিশু অপব্যবহারের প্রধান কারণ হল পরিবার ও কর্মস্থলে উভয়ক্ষেত্রেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার অক্ষমতা এবং এই অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে পিতামাতা কিংবা নিয়োগকর্তার দিক থেকে। সেই অক্ষমতার কারণেই এঁরা শিশুকে অপব্যবহার করতে চান। অধ্যাপক রাম আহুজা (Ram Ahuja) শিশু অপব্যবহারের যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৫ থেকে ১৫ জন পিতামাতা এবং নিয়োগকর্তার অপব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে।

দৈহিক অপব্যবহারের বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা উপস্থাপন করেছেন। কেউ বলেছেন শিশুকে দৈহিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক চাপ, কেউ বলেছেন পারিবারিক তথা সামাজিক চাপ এবং অন্যরা বলেছেন বিশেষ পরিস্থিতির চাপে পড়ে কিছু ব্যক্তি শিশুকে অপব্যবহার করে। পূর্বে উল্লিখিত কেওয়ালরামানি (Kewalramani) কৃত সমীক্ষায় শিশুর দৈহিক অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায়—শিশুদের পড়াশোনায় অমনোযোগ (৯ শতাংশ), পিতামাতার প্রতি শিশুর বিরামহীন অবাধ্যতা (৩৫ শতাংশ), পিতা-মাতার নিজেদের মধ্যে কলহ (১৯ শতাংশ), সহোদরদের মধ্যে মারপিট (৫ শতাংশ), শিশুর স্ব-অর্জিত অর্থ পিতামাতাকে প্রত্যর্পণ না করা (৫ শতাংশ) এবং ধূমপান করা, চুরি করা ইত্যাদি অসদ্ আচরণের অভিযোগ শিশুদের বিরুদ্ধে (৪ শতাংশ) ইত্যাদি কারণসমূহ পিতামাতা বা অভিভাবকদের দৈহিক শিশু অপব্যবহারের দিকে চালিত করেছে।

আবেগগত অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধানত চারটি কারণকে চিহ্নিত করা হয়, যেমন দারিদ্র্য, পিতামাতার নিজেদের শৈশবে অত্যাচারের তিক্ত অভিজ্ঞতা, পরিবারে সুন্দর ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অভাব এবং পরিশেষে মাদকাসক্তি। কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে শিশু অপব্যবহারকারী ৫৫ শতাংশ পিতামাতা নিম্ন আয় বিশিষ্ট (মাসিক আয় ১০০০ টাকার নিচে)। এছাড়া, ৭৯ শতাংশ পিতামাতা নিজেদের শৈশবে অত্যাচারিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট। কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় পিতা বা মাতার মাদকসক্তিকে শিশু অপব্যবহারের নিয়ামক বলে চিহ্নিত হয়নি। অবশ্য ম্যাটলিন (১৯৮১) শিশু অপব্যবহারের ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত পিতামাতার ভূমিকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করেছেন।

শিশুর ওপর যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রেও চারটি কারণকে নির্দেশ করা যায়—মাতাপিতার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব, পরিবারের ভাঙন, ব্যবহারকারীর মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং শিশুর প্রতি হৃদয়হীনতা। পূর্বে উল্লেখিত কেওয়ালরামানির সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুকে যৌন অপব্যবহারের পশ্চাতে ব্যক্তির কয়েকটি আচরণগত বৈশিষ্ট্য কার্যকরী থাকে এবং এই আচরণ হচ্ছে একাধিক উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবের ফলশ্রুতি। পরিবারের মধ্যে কিংবা পরিবারের বাইরে এবং বিশেষত কর্মক্ষেত্রে এই অপব্যবহার ঘটে থাকে। কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় বালিকার একাকিত্বের সুযোগ গ্রহণ করে তাকে যৌন অপব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে, সামাজিক অপব্যবহার অর্থাৎ শিশু পাচার, শিশু শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ ইত্যাদির জন্যে দায়ী কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক লেনদেন, লোভ ও আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে পিতামাতা তাদের শিশু পুত্র বা শিশু কন্যাকে পাচারকারীদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে অন্য যে কারণই দায়ী থাকুক না কেন সামগ্রিকভাবে এইসব ঘটনার মাধ্যমে শিশুর প্রতি ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারে হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়।

২.৩.৪ শিশু অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

শিশু অপব্যবহার যে কোন সভ্য সমাজের একটি গভীরতর সামাজিক সমস্যা, সন্দেহ নেই। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জরুরী হল শিশু অপব্যবহারের অমানবিক ও নিষ্ঠুর দিকটি সম্পর্কে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সচেতন করা। এর জন্যে প্রয়োজন ক্রমাগত প্রচার। শিশু যে মানবজাতির মধ্যে, দেশের জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। সরকারি তরফে এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে শিশু অপব্যবহার রোধ করা এবং অপব্যবহৃত শিশুর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.৪ শিশু শ্রম

শিশু অপব্যবহারের একটি বিশেষ দিক হল শিশুশ্রম। বিশ্বে স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা যায় এক বিরাট সংখ্যক শিশুশ্রমিক শহরে ও গ্রামে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই একই ছবি দেখা যায়। আমাদের দেশে শহরে ও গ্রামে শিল্পের অসংগঠিত ও অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে অসংখ্য শিশুশ্রমিক। ১৯৯১ সালের আদমসুমারির হিসাবে ভারতবর্ষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৩ লক্ষ। শিশু শ্রমিকের এই সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমেই আমাদের পক্ষে হয়তো অনুমান করা কঠিন হবে না যে শিশু শ্রমের সমস্যাটি হচ্ছে বহুমুখী এবং নানা স্তরবিশিষ্ট। তবে শিশু শ্রমজনিত সমস্যার ওপর আলোকপাত করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন কাকে বলব শিশু শ্রম?

২.৪.১ শিশু শ্রমের সংজ্ঞা

বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিশু শ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তার মতে ''As an economic practice it (Child labour) obviously refers to the employment of children in gainful practices and occupation...to add...some more money to the family budget'' অর্থাৎ লাভজনক কাজের মাধ্যমে সেখানে শিশুর শ্রম পরিবারের বাজেটে আরও কিছু বাড়তি অর্থ যোগ করতে পারবে, তাকেই শিশু শ্রম বলা যেতে পারে। অধ্যাপিকা দত্তগুপ্তা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত শিশু শ্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সাধারণ ক্ষেত্রে বয়সের নিরিখে একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের থেকে শিশু শ্রমিককে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। তাই শিশু শ্রমিক বলতে আমরা বুঝি ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের, যারা জীবিকা নির্বাহের জন্যে বা পরিবারের বাড়তি রোজগারের জন্যে নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে বা ধারণাগত দিক থেকে শিশু শ্রমিকের যে সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন কোন দেশের আইনগত বা সরকারি সংজ্ঞাই কার্যক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিশু শ্রমিকের হার গণনার ক্ষেত্রে ভারতের জনগণনায় শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সকাল ৫ থেকে ১৪ এই বয়ঃসীমাকে শিশুশ্রমিক নির্দেশক বয়স হিসাবে গণ্য হয়েছে।

২.৫ শিশু শ্রমের কারণ

কমবয়সী শিশুদের অর্থকরী কর্মে নিয়োগের পেছনে সক্রিয় আছে একাধিক কারণ যেমন অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ বলতে বোঝায় অবশ্যই দারিদ্র্যকে। নানা সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পরিবার অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যেই অল্পবয়সী শিশুদের কলকারখানা বা যে কোন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। Indian Labour Organisation (ILO) বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯৯২ সালে তাদের একটি প্রতিবেদনে, পারিবারিক দারিদ্র্যকে শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। পারিবারিক কারণ হিসাবে দেখা যায় উপার্জনকারী সদস্যের শারীরিক অক্ষমতা, নেশাগ্রস্ততা, পরিবারে অত্যধিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি। এইসব কারণে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে বিপদগ্রস্ত হলে শিশুরা অর্থ রোজগারের জন্যে নানা ধরনের কাজে যোগদান করে।

ব্যক্তিগত কারণ বলতে অনেক সময় লোভের বশে শিশুর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করাকে বোঝায়। অনেকে পড়াশোনায় অমনোযোগের কারণে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কাজে নিযুক্ত হয়। এছাড়া দেখা যায়, অনেক সময় পিতামাতা অর্থের লোভে সন্তানকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে কাজে নিয়োগ করছেন। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিককে নিযুক্ত করার পেছনে মালিক শ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থ হয়, কারণ এই ধরনের শ্রমিককে অল্প মজুরীতে বেশি সময় ধরে কাজ করানো যায়। অল্পবয়সী শ্রমিকদের কোন ইউনিয়ন থাকে না বলে, এরা দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্যে সংঘবদ্ধ হতে জানে না। অনেক সময় ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেনেও অপরিসীম দারিদ্র্যের কারণে তারা কাজ ছেড়ে দিতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, নিম্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের পরিবারের পিতামাতারা পুত্রশিশুকে অর্থ উপার্জনের যোগ্য একক মনে করে। তাই অনেক সময় অল্প বয়সেই পড়াশোনা ছাড়িয়ে অর্থ রোজগারের লোভে শিশুকে কাজে নিয়োগ করে। আর শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক মূল্যবোধহীনতা, নিরাপত্তার অভাব এবং পড়াশোনার পদ্ধতি আকর্ষণীয় মনে না হওয়ার দরুন এরা শ্রমজগতে প্রবেশ করে অর্থ উপার্জন করাই শ্রেয় মনে করে।

২.৬ কন্যাশিশু শ্রমিক ঃ বাস্তব চিত্র

শিশু শ্রমিক নিয়ে আলোচনায় আমরা সাধারণত সামগ্রিকভাবে পুত্র শিশু শ্রমিককেই ধরি, কন্যা শিশুকে তেমনভাবে আলোচনার পরিসরে আনি না। তবে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে শহরের বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে গৃহ পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত রয়েছে কত বালিকা এবং বড় বড় শহরের রাস্তায় কাগজ ও পলিথিন কুড়িয়ে বেড়ায় কতজন শিশু বালিকা তার কোন সরকারি পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। এছাড়া, গ্রাম ও শহরে শিল্পের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজকর্মে কত কন্যাশিশু যে নিয়োজিত আছে, তার হিসাবে আমরা সরকারি নথিপত্রে পাই না। তবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর সংখ্যক কন্যাশিশু নানা ধরনের অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিযুক্ত। গৃহভিত্তিক অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে রয়েছে বিড়ি, পাঁপড় বা আচার তৈরি, লেস বা জরি বোনা ইত্যাদি। সংগঠিত ক্ষেত্রে দেখা

যায় যে তামিলনাড়ুর কামরাজনগর, শিবকাশী ও চিদাম্বরনগর জেলায় বিভিন্ন দেশলাই তৈরির কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিককের মধ্যে ৬০ শতাংশ হচ্ছে বালিকা, যাদের গড় বয়স ১০ থেকে ১৩ বছর। অনুরূপভাবে উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে তালা নির্মাণ কারখানায় বা মির্জাপুরে কার্পেট শিল্পে নিযুক্ত আছে এক বিরাট সংখ্যক কন্যা শিশু শ্রমিক। বেনারসে সাবেকী জরি এমব্রয়ডারী শিল্পে, লক্ষ্ণৌতে চিকন শিল্পে নিয়োজিত অজস্র বালিকা কম মজুরির বিনিময়ে পরিবারের দারিদ্র্যের মোকাবিলায় এসব ধরনের কাজে যুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমব্রয়ডারী বা বিভিন্ন সূচী শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের মতো শিশু কন্যা শ্রমিককে বেশি পছন্দ করা হয়, কারণ তাদের হাতে কাজ সূক্ষ্ম। এছাড়া, উত্তর-পূর্ব ভারতের চা বাগানগুলিতে, বিশেষ করে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর কন্যাশিশু শ্রমিক কাজ করে।

২.৬.১ শিশুশ্রমিক নিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র

আমাদের দেশে শিশুশ্রমের সমস্যা যতটা শহরকেন্দ্রিক, প্রায় ততটা বা তার থেকেও বেশি গ্রামীণ। গ্রামাঞ্চলে যত শিশুশ্রমিক আছে তার ৯০ শতাংশ হয় কৃষিকাজ নয়তো ঐ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কাজ যেমন বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশুচারণ, মাছ ধরা, জলসেচন করা ইত্যাদি সাধারণত শিশুদের দিয়েই করানো হয়। বরোদা জেলার গ্রামীণ ক্ষেত্রে শিশুদের ওপর সমীক্ষা করে নলিনী ওগেল (Nalini Ogale) দেখিয়েছেন সেখানে শিশু শ্রমিকদের রোজ ৮/১০ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। অধ্যাপক এস. বি. সাক্সেনা (S. B. Saxena) গুজরাটের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ভারুচ (Bharuch) জেলার মিয়া মাতার (Miya Matar) গ্রামে যে সমীক্ষা কাজ চালান, তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে কৃষিকাজে যুক্ত আছে ৭২ শতাংশ শিশুশ্রমিক, কৃষিকাজ ও পশুপালনে নিয়োজিত ১৪ শতাংশ শিশু এবং কৃষি ও গৃহকর্মে নিযুক্ত বাকি ১২ শতাংশ শিশু। ৯৮ শতাংশ শিশু শ্রমিককে দৈহিক ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ 'ঠিকা শ্রমিক' হিসাবে যুক্ত।

বড় বড় শহরগুলিতে বেশিরভাগ শিশু শ্রমিক রেস্তোরাঁয়, হোটেলে, গ্যারেজে, ছোট ছোট কারখানায়, পেট্রোল পাম্পে কাজ করে। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দীর্ঘক্ষণ তাদের কাজ করতে হয়। সামান্য কোন অন্যায় বা অবাধ্যতার জন্যে মালিকের হাতে তাদের ভর্ৎসনা ও প্রহার সহ্য করতে হয়। বরোদা শহরে ১৮০ জন শিশুশ্রমিকের ওপর কমলা শ্রীনিবাসন (Kamala Srinivasan) যে সমীক্ষা চালান, তাতে দেখা গেছে যে শিশুশ্রমিকরা ১২ বছর বয়স হবার আগেই নানা অর্থকরী কাজে যোগদান করে। শ্রীমতী শ্রীনিবাসন বরোদা শহরে শিশুশ্রমিকদের কাজের ৬টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন, যেমন গৃহ পরিচারক (এই ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শিশুকন্যা নিয়োজিত), গ্যারেজ কর্মী, নির্মাণ কর্মী, রেঁস্তোরায় বাসনপত্র ধোয়া, রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে কাজ এবং ছোটখাটো জিনিসপত্র বিক্রি ইত্যাদি।

ভারতের রাজধানী শহর দিল্লিতে প্রায় ৬০ হাজার শিশু ধাবা, চায়ের দোকান ও রেস্তোঁরায় দৈনিক মাত্র ৮-১০ টাকার পারিশ্রমিকে কাজ করে থাকে। দিল্লি ছাড়া অন্যান্য বড় বড় শহর ও মহানগরীতে শিশুশ্রমিকদের ওপর যেসব সমীক্ষা করা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, মুম্বাই শহরে অগণিত শিশুশ্রমিক নানা ধরনের কাজে যুক্ত। যেমন, সাহারানপুরে কাঠখোদাই শিল্পেই প্রায় ১০,০০০ শিশুশ্রমিক নিযুক্ত। এদের দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, কিন্তু পারিশ্রমিক হিসাবে পায় মাত্র ৭ থেকে ৮ টাকা। বারাণসীতে রেশম বয়ন শিল্পে যুক্ত আছে ৫,০০০ শিশু। তামিলনাড়ুর রামনাথপুরম জেলার শিবকাশীতে দেশলাই এবং আতসবাজি শিল্প কারখানায় ৫,০০০ শিশুশ্রমিক কাজ করে।

ফিরোজবাদের কাচশিল্পে এবং মির্জাপুরের কার্পেট শিল্পে নিয়োজিত ৫,০০০ শিশুশ্রমিক। অন্ধ্রপ্রদেশের মর্কপুরের স্লেট শিল্পে, মধ্যপ্রদেশের স্লেট-পেন্সিল শিল্পে, উত্তপ্রদেশের আলিগড়ে তালা শিল্পে নিযুক্ত অসংখ্য শিশু যাদের বয়স ১৪ বছরের নীচে। উত্তরপ্রদেশেরই মোরাদাবাদে পিতল সামগ্রী শিল্পে নিযুক্ত আছে ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ শিশুশ্রমিক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিখনন কাজেও অগণিত শিশুশ্রমিক নিযুক্ত। এইসব ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা দালাল বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে শিশুশ্রমিক যোগাড় করে থাকে। এই ধরনের কাজে শিশুদের চাহিদাই বেশি, কারণ তাদের শোষণ করা যায় এবং বয়স্ক শ্রকিমদের মত এরা প্রতিবাদী হতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের নানা শহর ও গ্রামীণ এলাকাতে শিশুরা শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়িশিল্পে নিযুক্ত আছে অসংখ্য শিশু। এছাড়া, ঐ জেলারই রেশম বয়ন শিল্পে ও রেশম চাষের কাজেও শিশুদের লাগান হয়। কলকাতা মহানগরীতে বড় বড় রেস্তোঁরায় হোটেলে, রাস্তার পাশের ধাবায়, চায়ের দোকানে দৈনিক স্বল্প মজুরীর ভিত্তিতে শিশুরা কাজ করে থাকে। পূর্ব কলকাতার বালব তৈরির কারখানাতে নিযুক্ত আছে অনেক শিশুশ্রমিক। এছাড়া, বস্তি অঞ্চলে গৃহভিত্তিক উৎপাদনেও ছোট ছোট শিশুদের কাজে লাগান হয়।

২.৬.২ শিশু শ্রমিক ঃ কাজের পরিবেশ

শিশু শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যেমন তাদের নানা ধরনের জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের কথা বলতে হয়, তেমনি উল্লেখ করতে হয় যে পরিবেশে তারা দিনে ৮/৯ ঘণ্টা কিংবা ১৩/১৪ ঘণ্টা কাজ করে, তার কথাও। পরিবেশের কথা বা কর্মস্থলের অবস্থার উল্লেখ ব্যতিরেকে শিশুশ্রমিকদের সমস্যার ভয়াবহতা অনেকটাই বোঝা যাবে না। আমরা দেখেছি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বা দারিদ্র্যের কারণে চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুরা খনিখনন কাজে, বালব্ তৈরির কাজে, আতসবাজি ও দেশলাই শিল্পে নিযুক্ত হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়। ১৪০০ সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার ফার্নেসের কাছে তারা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে, তেমনি আর্সেনিক ও পটাসিয়ামের মতো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল তাদের ব্যবহার করতে হয়। সপ্তাহে কোন ছুটি শিশু শ্রমিকদের দেওয়া হয় না, সাধারণত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা এরা কাজ করে। কাজে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে মালিকের প্রহারের হাত থেকে এরা রেহাই পায় না। অনেক সময় কর্মস্থলে কোন জিনিসের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এদের পারিশ্রমিক থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়। দারিদ্র্যের কারণে এরা কাজ ছেড়ে দিতেও পারে না। কর্মস্থলে ঘিঞ্জি, অন্ধকার নোংরা পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাটানোর ফলে শিশুরা প্রায়শই নানা ধরনের রোগের শিকার হয়। এগুলিকে বলা যায় 'কর্মজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা' বা Occupational Health Hazards। দীর্ঘসময় এক দিকে তাকিয়ে কাটাতে হয় বলে এরা চোখের অসুখে ভোগে। ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করার দরুন এরা চর্মরোগ ও ফুসফুসের রোগের শিকার হয়। তাই ব্রঙ্কাইটিস, টিউবারকিউলোসিস, অ্যাজমা, বাত বা আর্থারাইটিস্ শিশু শ্রমিকদের কতকগুলি প্রচলিত অসুখ। বাজি কারখানায় কর্মরত শিশুরা অনেকে আগুনজনিত দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণের দরুন অগ্নিদগ্ধ হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনায় এদের অঙ্গহানি ঘটে, এমন কি অনেকে প্রাণও হারায়। বিভিন্ন মহানগরীতে (দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা) শিশুশ্রমিকদের ওপর কৃত সমীক্ষায় দেখা গেছে নোংরা পরিবেশে কর্মরত শিশুরা অপুষ্টি, কম ওজন, দৃষ্টিহীনতায় ভোগে। অথচ অসুখের চিকিৎসা করার মতো যথেষ্ট সংগতি এদের নেই, আর নিয়োগকর্তা কিংবা মালিকেরা এদের স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়।

২.৭ শিশু শ্রম ঃ সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং সরকারি পদক্ষেপ

ভারতীয় সংবিধানে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

⊙ ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানায়, খনিতে বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবে না (২৪ নং অনুচ্ছেদ)।

⊙ শৈশব ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বস্তুগত অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে হবে (৩৯ নং অনুচ্ছেদ [চ])।

⊙ শিশুদের ১৪ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র তাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদান করবে (৩৫ নং অনুচ্ছেদ)।

সংবিধানে উল্লিখিত নির্দেশাবলীকে রূপায়িত করার জন্যে ভারত সরকার কর্মরত শিশুদের কয়েকটি আইনী রক্ষাকবচ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যেমন—

- কারখানা আইন, ১৯৪৮
- খনি আইন, ১৯৫২
- মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস আইন, ১৯৬১
- বিড়ি ও সিগার কর্মচারী আইন, ১৯৬৬
- বাগিচা শ্রম আইন, ১৯৫১
- ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮

শিশুশ্রমিকের কল্যাণ সাধনের জন্যে আমাদের জাতীয় সরকার ১৯৭৯ সালে এম. এস. গুরুপদ স্বামীর নেতৃত্বে দি ন্যাশনাল কমিটি অন চাইল্ড লেবার (The National Committee on Child Labour) গঠন করে। এই কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত আইনগুলি এলোমেলো থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের বিধানগুলিও অসঙ্গতিপূর্ণ থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে এই কমিটি প্রচলিত আইনগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে একটি অখণ্ড আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৮৬ সালে "শিশু শ্রম (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন" (The Child Labour [prohibition & regulation] Act) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দান করা হয়; যেমন—শিশু শ্রমিকদের ৩ ঘণ্টা কাজের অন্তরে ১ ঘণ্টা অবসর দেওয়া, সপ্তাহে ১ দিন সবেতন ছুটি দেওয়া এবং শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। তবে শুধু শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ নয়, কিভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া যায় সেই ব্যাপারেও জাতীয় সরকার চিন্তাভাবনা শুরু করে। আর সেই চিন্তাকে সামনে রেখেই ১৯৮৭ সালের আগষ্ট মাসে শিশু শ্রমিকদের জন্যে একটি জাতীয় নীতি তৈরি করা হয়। এই নীতিতে তিনটি কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয়; যেমন—(১) আইনগত কর্মসূচী (২) উন্নয়নমূলক কর্মসূচী এবং (৩) পরিকল্পনামাফিক কর্মসূচী। প্রায় একই সময়ে জাতীয় শিশুশ্রম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে এই কর্মসূচীকে আরও শক্তিশালী করা হয় যাতে ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিপজ্জনক কাজ থেকে মুক্ত করে এনে জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্পের আওতায় তাদের শারীরিক ও মানসিক পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়। কর্মসূচীটির আওতায় যে ১০টি জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, সেগুলি হল—

(১) অন্ধ্র প্রদেশের মর্কপুরে স্লেট শিল্প

(২) তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে দেশলাই শিল্প

(৩) মধ্যপ্রদেশের মান্দসাউরে স্লেট শিল্প

(৪) উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদে কাঁচ শিল্প

(৫) উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে পিতল সামগ্রী শিল্প

(৬) রাজস্থানের জয়পুরে পাথর মাজাই শিল্প

(৭) উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে তালা তৈরি শিল্প

(৮) জম্মু ও কাশ্মীরে কার্পেট শিল্প

(৯) গুজরাটের সুরাটে হীরক মাজাই শিল্প

(১০) উত্তরপ্রদেশের ভাদোই এবং মির্জাপুরে গলিচা শিল্প।

এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল যেসব শিশু শ্রমিকদের কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে তাদের প্রথাগত এবং প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় স্থাপন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিকল্প পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া এবং বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করা।

২.৭.১ শিশু শ্রম ঃ আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি

শিশুদের অধিকার বিষয়ে ১৯৮৯-এর ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শিশু শ্রম প্রথা ধাপে ধাপে দূর করার জন্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। শুধু দূর করাই নয়, শিশুরা যাতে শিল্প সংস্থায় শোষণের শিকার না হয় তার লক্ষ্যেও চলেছে নিরন্তর প্রয়াস। সংস্থা মূলত পাঁচটি বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছে। এগুলি হল শিশুশ্রম বিলোপ কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকদের নিরাপত্তা দান, শিশু শ্রমপ্রথার মূল কারণকে আক্রমণ করা, ভবিষ্যতে উপযুক্ত কাজ খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে শিশু শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং যেসব শ্রমিকদের পিতামাতা কর্মরত তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। এরও আগে ১৯৮৭ সালে সার্ক (SAARC) আয়োজিত বিশেষ সম্মেলন দক্ষিণ এশিয়ার শিশুদের জীবনের মানের উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে চারটি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল; যেমন—(১) উদ্বর্তন (২) উন্নয়ন (৩) সংরক্ষণ এবং (৪) অংশগ্রহণ।

২.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককে আমরা প্রথমে শিশু অপব্যবহার ও পরে শিশু শ্রম নিয়ে আলোচনা করলাম। শিশু অপব্যবহার বলতে কেউ বলছেন দৈহিক নির্যাতন, আবার কেউ বুঝিয়েছেন মানসিক নির্যাতনকে। সমাজ বিজ্ঞানী বার্জেস প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা। বার্জেস বলেছেন, অভিভাবক বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে শিশু যখন কোন দুর্ঘটনা বহির্ভূত শারীরিক ও মানসিক আঘাত পাচ্ছে, তখন তাকেই শিশু অপব্যবহার নামে অভিহিত করা যায়। তিনটি প্রধান শ্রেণীতে এই অপব্যবহারকে ভাগ করা যায়—দৈহিক, যৌন এবং আবেগগত অপব্যবহার। সাধারণত দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় পুত্র শিশু, কিন্তু যৌন ও সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয় কন্যাশিশু।

নিগ্রহ, নিপীড়ন, শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণের চেষ্টার মাধ্যমে যৌন অপব্যবহার করা হয়; অন্যদিকে কন্যাশিশুকে এক রাজ্য বা এক দেশ থেকে অন্য রাজ্য বা দেশ পাচার করা এবং পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা। এইসব অপব্যবহারের পশ্চাতে সক্রিয় কারণগুলির মধ্যেই রয়েছে মানুষের হৃদয়হীনতা, মানসিক বিকৃতি, অর্থনৈতিক লেনদেন, লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা। শিশু অপব্যবহারের একটি বিশেষ দিক হল শিশু শ্রম। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়, জীবিকা নির্বাহের জন্যে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুরা যখন নানা ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত হয়, তাকেই শিশু শ্রম বলে। অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নানা কারণে কমবয়সী শিশুদের সংসারের বাড়তি রোজগারের জন্যে অর্থকরী কাজে, এমন কি জীবনের ঝুঁকিযুক্ত কাজেও নিয়োজিত করা হয়। অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে শিশু শ্রমের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে পারিবারিক দারিদ্র্য। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা ILO একই কারণকে শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে নির্দেশ করেছে। বড় বড় শহরগুলিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় শ্রমের বাজারে নিয়োজিত রয়েছে অজস্র বালিকাও। এরা কোথাও পরিচারিকার কাজে রত, কোথাও নিযুক্ত রয়েছে শ্রম-নিবিড় কাজে যেমন চা-পাতা সংগ্রহ কিংবা জরি বোনা বা এমব্রয়ডারির কাজে। তবে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এরা মজুরি পায় নামমাত্র। কাজ হারাবার ভয়ে প্রতিবাদের ভাষা এরা প্রয়োগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে, ছেলে শ্রমিকেরাও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যেমন—আতসবাজির কারখানায় বা দেশলাই তৈরির কাজে নিজেদের নিয়োগ করে। অথচ শিশু শ্রম রোধ করার কথা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে। গ্রহণ করা হয়েছে নানা সরকারি নীতি। প্রণীত হয়েছে শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৮৬ সালে)। জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ১০টি জাতীয় প্রকল্প। শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও শিশু শ্রমিকদের শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে পাঁচটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইউনিসেফ (UNICEF) তাদের একটি বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে—"এমন দিন আসছে যখন একটি দেশের মূল্যায়ন কেবলমাত্র তার অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তি, কিংবা রাজধানীর চাকচিক্য ইত্যাদি দিয়ে বিচার করা হবে না—বিচারের মাপকাঠি হবে যারা সামাজিক নিপীড়নের শিকার এবং যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্যে কি করা হয়েছে তার ওপর।" শিশুর অপব্যবহার ও শিশু শ্রম সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রতিবেদনটি হতে পারে আমাদের চক্ষু উন্মীলক বা eye-opener।

২.৯ অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। (প্রতিটি ২০ নম্বর)

(ক) আমাদের সমাজে কী কী ধরনের শিশু অপব্যবহার দেখা যায় তা আলোচনা করুন।

(খ) শিশু অপব্যবহারের কারণগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিককে নিয়োগ করা হয় তা আলোচনা করুন।

(ঘ) শিশু শ্রম প্রতিরোধ করার জন্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সরকারি পদক্ষেপগুলি আলোচনা করুন।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রতিটি ১২ নম্বর)

(ক) কন্যাশিশু কিভাবে অপব্যবহারের শিকার হয় তা বিশ্লেষণ করুন।

(খ) শিশু শ্রমের কারণগুলি পর্যালোচনা করুন।

(গ) কন্যা শিশুও কিভাবে শ্রমের বাজারে ব্যবহৃত হয় তার বাস্তব চিত্রটি উপস্থাপন করুন।

(ঘ) শিশু শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (প্রতিটি ৬ নম্বর)

(ক) শিশু অপব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

(খ) কিভাবে শিশু অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(গ) শিশু শ্রম বলতে কী বোঝায়?

(ঘ) শিশু শ্রমিকদের 'কর্মজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা' বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) শিশু শ্রম বিরোধী সাংবিধানিক ধারাগুলি আলোচনা করুন।

(চ) জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্পের অধীনে কোন কোন শিল্পকে গ্রহণ করা হয়েছে?

(ছ) শিশু শ্রম নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলি লিখুন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। আহুজা রাম—স্যোশ্যাল প্রব্লেমস্ ইন ইন্ডিয়া, সেকেন্ড এডিশান, রাওয়াত পাবলিকেশানস্ নিউ দিল্লি, ১৯৯৯।

২। কেম্প আর. এস. এবং কেম্প সি. এইচ—চাইল্ড লেবার, ফল্টানা লন্ডন, ১৯৭৮।

৩। কেওয়ালরামানি সি. এস. চাইল্ড অ্যাবিউস, রাওয়াত পাবলিকেশনস্, জয়পুর, ১৯৯২।

৪। চক্রবর্তী বাসবী—গার্ল চাইল্ড লেবার ঃ লস্ট চাইল্ড হুড; আলোচনাপত্র—ক্যারিড, কলকাতা ও আই. ডি. আর, বাংলাদেশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ (বিষয় ঃ কালচার অফ পিস ইন সাউথ এশিয়া ঃ উইমেন পার্সপেক্টিভ) প্রদত্ত এবং পঠিত।

৫। চক্রবর্তী বাবসী—গার্ল চাইল্ড ইন বিড়ি মেকিং ঃ এ কেস স্টাডি অফ কলকাতা; আলোচনাপত্র, ডিপার্টমেন্ট অফ সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত ও পঠিত।

৬। শ্রীনিবাসন কমলা ও বিনা গন্ড্রোত্রা—চাইল্ড লেবার, মাল্টি ডাইমেনশ্যানাল প্রব্লেম, অজন্তা পাবলিকেশন, দিল্লি, ১৯৯৩।

৭। শর্মা বি কে অ্যান্ড মিত্র. ভি—চাইল্ড লেবার অ্যান্ড আর্বান ইনফরম্যাল সেক্টর। দীপ অ্যান্ড দীপ পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।